অথর্ববেদ সংহিতা – চতুর্থ অধ্যায়

সুকুমারী ভট্টাচার্য

পাঠভেদ (অথর্ববেদ সংহিতা)

অথর্ববেদ সংহিতার দুটি শাখা পাওয়া গেছে। প্রয়াত প্রখ্যাত গবেষক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য উড়িষ্যায় পৈপ্পলাদ শাখার পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়ার পূর্বে হুইট্‌নি শৌনক শাখাটি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে অথর্ববেদের নীটি শাখা উল্লিখিত হয়েছে : শৌনক, তৌদ, মৌদ, পৈপ্পলাদ, জাজল, জলদ, চরণবৈদ্য, ব্রহ্মাবদ ও বেদদর্শ। এদের মধ্যে প্রথম ছটি সম্ভবত পৃথক শাখারূপে যথার্থই বিদ্যমান ছিল ; চরণবৈদ্য বা ভ্রমমাণ চিকিৎসকও সম্ভবত অথর্ববেদের ভেষজ বিষয়ের সূক্তগুলি থেকে উদ্ভূত প্রতিশব্দ বিশেষ। অনুরূপভাবে ‘ব্রহ্মাবদ’ কথাটি ব্রহ্মবেদ শব্দের সামান্য রূপান্তরিত প্রতিশব্দ। স্মরণীয়, অথর্ববেদের পুরোহিতের নাম ব্রহ্মা। ‘বেদদর্শী’ শব্দের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ অবহেলিত অথর্ববেদের গৌরবায়ণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা যে বিপুল সংখ্যক পাঠভেদের নিদর্শন পাই তা মূলত যজুর্বেদের কাশ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার মধ্যবর্তী পাঠভেদের সঙ্গেই তুলনীয়। পৈপ্পলাদ শাখার মধ্যে ব্রাত্য অংশ প্রায় সম্পূর্ণতই অনুপস্থিত ; এমন কি, অথর্ববেদের দুটি সূত্রগ্রন্থ, বৈতান ও কৌশিকের মধ্যেও তার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মূলপাঠ (অথর্ববেদ সংহিতা)

অথর্ববেদ-সংহিতা মোট কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত; তার মধ্যে শেষ দুটি অধ্যায় স্পষ্টতই পরবর্তীকালে সংযোজিত যদিও বহুপূর্বেই এগুলি রচিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে মোটামুটিভাবে সমান দৈর্ঘ্যের সূক্ত থাকলেও ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে হ্রস্বতর সূক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত সূক্তগুলিতে সামাজিক ও পরিবারিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতিযোগী ও শত্রুদের ধ্বংস কামনায় প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। সংহিতায় দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অংশে প্রাপ্ত সূক্তগুলির অনুরূপ রচনার সন্ধান পাই; তবে এছাড়াও বহুসংখ্যক দীর্ঘতর দার্শনিক ও সৃষ্টিতত্ত্বমূলক সূক্তও সেখানে পাওয়া যায়। তৃতীয় অংশ অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে বিংশতিতম অধ্যায় স্বভাববৈশিষ্ট্যে পরিশিষ্ট জাতীয়; অথর্ববেদ প্রতিশ্যাখ্য এদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ব'লেই এই অংশ যে অনেকটা পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় ।

প্রথম আঠারটি অধ্যায় মোট চৌত্রিশটি অনুবাকে বিভক্ত; আবার সপ্তদশ অধ্যায়টি সাতটি অনুবাকযুক্ত একটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত। বিংশতিতম অধ্যায়ে যে নয়টি অনুবাক রয়েছে, তার মধ্যে তৃতীয় অনুবাকে তিনটি পর্যায়সূক্ত রয়েছে। অথর্ববেদ সংহিতায় মোট ছ'হাজার মন্ত্র রয়েছে। উনবিংশতিতম অধ্যায়ের পাঠ বহু ক্ষেত্রেই অশুদ্ধ, এতে ব্যাকরণ ও শৈলীগত ত্রুটি লক্ষিত হয়। বস্তুত এই সংহিতার বিংশতিতম অধ্যায়টিও সম্ভবত স্বল্প-প্রতিভাশালী রচয়িতা ও সম্পাদকের দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। বিংশতিতম অধ্যায়ের অধিকাংশ উপাদানই ঋগ্বেদ থেকে আহত হয়েছে। অভিন্ন বিষয়বস্তুবা সত্রে ঋগ্বেদীয় সূক্তের বহু খণ্ডিত চরণকে একত্র গ্রথিত করে নূতন নূতন মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। প্রথম এগারোটি অধ্যায়ের বিষয়সূচিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য

রয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের দীর্ঘতম অংশে সুদীর্ঘ ভূমি-সূক্ত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মূলত ধর্মতত্ত্বমূলক মন্ত্র সন্নিবিষ্ট; চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রধান বিষয়বস্তু বিবাহ, পঞ্চদশে ব্রাত্য এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ গদ্যভাষায় রচিত ষোড়শ অধ্যায়ে সাধারণভাবে দুঃস্বপ্ন দূরীকরণের মন্ত্র বিধৃত রয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে যে একটিমাত্র সূক্ত আছে, তাতে আছে সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা; আবার অষ্টাদশ অধ্যায়টি মূলত পারলৌকিক ক্রিয়া-সংক্রান্ত সূক্তে পরিপূর্ণ। চতুর্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের বহু উপাদান। ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত; সেই সঙ্গে সাধারণ-বিষয়বস্তু সম্বলিত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঋগ্বেদীয় মন্ত্রাংশকে একত্র করেও বহু পৃথক সুক্তও গঠিত হয়েছে।

রচয়িতা (অথর্ববেদ সংহিতা)

অথর্ববেদ সংহিতায় সূক্তসমূহের রচয়িতারূপে বহুসংখ্যক নূতন নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রয়েছে পরবর্তী মহাকাব্য ও পৌরাণিক যুগের কিছু কিছু বিখ্যাত নাম, যেমন বুদ্ধ, আজমীঢ় ও নারায়ণ। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অথর্ব, ভৃগু ও অঙ্গিরার নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের অন্তিম পর্যায়ে প্রজাপতি নামে যে দেবতার উদ্ভব ঘটেছিল, অথর্ববেদে তিনি অন্যতম রচয়িতা। তেমনি ঋগ্বেদের অন্যতম অর্বাচীন দেবতা 'ব্রহ্মা'কে অথর্ববেদের বহু আধ্যাত্মিক ও ধর্মতত্ত্বমূলক সূক্তের রচয়িতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ কল্পনা কৃত্রিম; ঐ সব সূক্তের রচয়িতা নয় বিষয়বস্তুই ব্রহ্মা বা পর্যতত্ত্ব। ঋষি ভৃগু কালের মতো বিমূর্ত ধারণার উপর ভিত্তি করেও সূক্ত রচনা করেছিলেন, আর অঙ্গিরা ব্যাধি, ডাকিনীবিদ্যা ও ইন্দ্রজালের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ঋগ্বেদে যে যম-দেবতাকে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে কিছু সূক্তের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও তিনি বহু সুক্তের রচয়িতা। ঋগ্বেদের বহু ঋষির নামে অথর্ববেদেও মন্ত্রদ্রষ্টারূপে উল্লিখিত; কিন্তু এখানে

যে নূতন নামগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি কৌতূহলাজনক : প্রধান শাখার রচয়িতা শৌনক, যম, প্রচেতা, শম্ভু এবং ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্র বা কৌশিক– এই শেষোক্ত জন অথর্ববেদের কৌশিক সূত্রের রচয়িতারূপেও কথিত। প্রায়ই আমরা নিম্নোক্ত সমাসবদ্ধ শব্দ খুঁজে পাই : ভৃগুরাথর্ব, ভৃগ্বঙ্গিরা, অথর্বাঙ্গিরা, প্রত্যঙ্গিরা, তিরশ্চিরঙ্গিরা। স্পষ্টতই অথর্ববেদের মৌলিক সূক্তগুলির প্রথম দ্রষ্টারূপে ভৃগু, অথর্ব ও অঙ্গিরার নাম পরবর্তীকালে ঐতিহ্যগতভাবে নির্দিষ্ট কিছু সূক্তের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি নাম বা গোষ্ঠী নামে পরিণত হয়। কুরু, কৌরুষ্টুতি ও কৌরুপথী নামগুলিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল আর্যবসতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কুরু নামটি গৌরবান্বিত হয়েছিল। অথর্ববেদ ব্রাহ্মণের রচয়িতা গোপথ সংহিতার কয়েকটি সূক্তেরও মন্ত্রদ্রষ্টারূপে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অথর্ব কখনোই রচয়িতারূপে উল্লিখিত না হলেও অথর্ববেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সূক্তে যেমন ব্রাত্য-সূক্তে, পৃথিবী ও অগ্নির প্রতি নিবেদিত সুক্তে এবং গভীর দার্শনিক ও কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি-মণ্ডিত স্কন্তসূক্তে তাকে মন্ত্রদ্রষ্টারূপে পাওয়া যাচ্ছে।

অথর্ববেদের সঙ্গে প্রধানত তিনটি নামই সম্পর্কিত : ভূগু, অথর্ব ও অঙ্গিরা; এইজন্য এই বেদকে অথর্বাঙ্গিরস বেদ, ব্রহ্মবেদ বা ভৃগ্বঙ্গিরস বলা হয়ে থাকে। সোমযাগের পুরোহিতদের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অগ্নিদেবের পুরোহিতরূপেই ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বার অস্তিত্ব স্বীকৃত। 'অথর্' শব্দটি অগ্নিবাচক প্রাচীন পারসিক শব্দ 'অতর্'-এর এবং পরবর্তীকালের আতস্-এর উৎস থেকে উদ্ভূত এবং অঙ্গিরা শব্দটি 'অগ্নি' শব্দের ধ্বনিগত বিপর্যাস থেকে উদ্ভূত—দুটি ক্ষেত্রেই অস্তিত্ববাচক প্রত্যয় (মতুপ ও র) যোগে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং অথর্ব শব্দটি যে ইন্দোইরাণীয় যুগের সমকালীন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এই শব্দটির তাৎপর্য অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং অগ্নি শব্দের বুৎপত্তিজাত প্রতিশব্দ 'অঙ্গিরস', তার স্থান

অধিকার করে নেয়। 'অগ্নিরস' শব্দের ইন্দো-ইয়োরোপীয় উৎস রয়েছে; গ্রিক ভাষায় এর সমজাতীয় শব্দ 'আঙ্গেলস' অর্থাৎ দূত। ঋগ্বেদে দূত শব্দ অগ্নির সাধারণ বিশেষণ এবং দৌত্য তার মৌলিক কর্মরূপে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ঋগ্বেদের বিখ্যাত দশরাজার যুদ্ধে সুদাসের বিরোধীপক্ষে অবস্থিত কৌম বা গোষ্ঠীর নামরূপে দ্রুহ্য ও তূর্বশের সঙ্গে ভূগুও উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত, ভূগু কৌম বা গোষ্ঠীর ইতিহাস ইন্দো-ইয়োরোপীয় পর্যায় থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। অগ্নিবাচক গ্রিক শব্দ ফ্লেগ্‌ম্-এর মধ্যে আমরা ভৃগুর প্রাথমিক সমজাতীয় শব্দের ধ্বনিরূপের সন্ধান পাই। অগ্নিকে নির্বাপিত হতে না দেওয়াই ছিল ভৃগুশ্রেণীভুক্ত পুরোহিতদের প্রাচীন দায়িত্ব।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ রচয়িতার নাম ব্রহ্মা। সম্ভবত, অথর্ববেদটি সংহিতা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেই তিনি পূর্বোক্ত তিনটি শ্রেণীর পুরোহিতদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। অগ্নি আদিম মানুষের বিস্ময় ও ভীতি উদ্রেক করত; প্রাথমিক স্তরের যে সমস্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় পটু পুরোহিতেরা অগ্নি মন্থন ও প্রজ্বলন করে তার সুরক্ষা ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করতেন, সমাজে তারা সার্বভৌম সম্মানের অধিকারী হতেন। চিরাগত এই অভ্যাসের কতকটা আভাস অথর্ববেদের 'ব্রহ্মা' শ্রেণীর পুরোহিতদের গৌরবলাভের মধ্যে নিহিত। ইন্দো-ইয়োরোপীয় বা ইন্দো-ইরাণীয় উৎসজাত তিনজন প্রধান পুরোহিতই অথর্ববেদে অগ্নি উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সমান্তরাল সোমচর্যা থেকে পৃথক কিন্তু অনুরূপ প্রাচীন অগ্নিচর্যার অংশরূপেই অথর্ববেদ ও তার পুরোহিতদের কার্যকলাপ ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'অথর্বাঙ্গিরস' শব্দের দুটি অংশের (অর্থাৎ অর্থবান ও অঙ্গিরস) তাৎপর্যই হ'ল অগ্নি এবং এই যুগ নামের মধ্যে অগ্নি-উপাসনা, তদপুযোগী প্রত্নকথা ও পুরোহিতদের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বরুণ ও পাতাললোকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ভৃগু অথর্ববেদের অন্যতম প্রধান রচয়িতা। ঋগ্বেদের ষষ্ঠমণ্ডলে কথিত হয়েছে যে, অথর্বকর্তৃক অরণিকাষ্ঠের সাহায্যে অগ্নি

উৎপাদনের রীতি অন্যান্যদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল; পরবর্তী সাহিত্য অথর্ব ভেষজ বিদ্যার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

পরবর্তীকালে যে অথর্ববেদ স্বীকৃতি লাভ করল, তার অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবত ছিল, রাজপুরোহিতরূপে অথর্ববেদের পুরোহিতদের বিশেষ গুরুত্ব ও সমাজে তাদের বিশেষ সুবিধাভোগীর ভূমিকা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষদিকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান হচ্ছিল, নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পুরণের জন্য অলৌকিক সহায়তা লাভের আশায় রাজারা কোনও জাদুকরকে রাজসভা ও রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোহিতরূপে নিয়োগ করতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। গ্রামের ‘শামান’ বা জাদু-পুরোহিতই এই মহিমান্বিত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন, এমন মনে করার কারণ নেই। তাদের মধ্যে যে সমস্ত পুরোহিতেরা আধ্যাত্মিক ও ঐন্দ্রজালিক রহস্য বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে উঠতেন, কেবলমাত্র তাদেরই রাজ-পুরোহিতরূপে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হ’ত, কিন্তু শামান পুরোহিত তার গ্রামবাসী যজমানদের মধ্যেই রয়ে যেতেন অনেকটা বর্তমান ওঝার ভূমিকাতে। যাই হোক, অথর্ববেদের পুরোহিতদের মধ্যে খুব বেশিসংখ্যক লোক এই নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতেন না, অধিকাংশ জাদু-বিদায় পারঙ্গম চিকিৎসক-পুরোহিতের পূর্বের মতোই ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালনা করতেন। সুতরাং অথর্ববেদের পুরোহিতদের মধ্যেও সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদ ছিল। ব্রহ্মৌদন, ব্রহ্মাগবী ও বিপুল দক্ষিণা নবোন্নীত রাজ-পুরোহিতেরাই ভোগ করতেন, অপরপক্ষে গ্রামের দরিদ্র শামান পুরোহিতদের সামান্য দক্ষিণাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হত।

অথর্ববেদের পুরোহিতরা রাজ-পুরোহিত রূপে নিযুক্ত হওয়ার পরে সমগ্র গোষ্ঠী তাদের মহিমা স্বীকার করে নিল, ফলে প্রাচীন-পন্থী পুরোহিত সম্প্রদায় এই নবোদিত পুরোহিত শ্রেণীকে আর পূর্বের মতো অবহেলা করতে পারল না। এই রাজপুরোহিতরা যজ্ঞের গূঢ় রহস্যে পারঙ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও

রাজন্যশ্রেণীর কল্যাণ কামনায় ইন্দ্রজালের প্রয়োগও শিখে নিলেন। অথর্ববেদ-বহির্ভূত অধিকাংশ শ্রৌতযাগে অথর্ববেদে শিক্ষিত পুরোহিত 'ব্রহ্মা' নামে অভিহিত হয়ে যজ্ঞের দায়িত্ব পালন করতেন; অন্যদিকে জনসাধারণের জন্য ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় গ্রামের 'শামান' বা জাদুপুরোহিতেরা নিযুক্ত থাকতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর সুক্তে এই ত্রিবিধ বিভাজন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় এই সূক্তগুলির উদ্দিষ্ট হল : আত্মিক সমৃদ্ধি, যজ্ঞ, কঠোর সাধনা, এবং সুখের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মকর্মসমূহ এবং ভাষার উৎকর্ষলাভ। কিছু কিছু সূক্তে পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাত্রিসমূহের বিবৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া, প্রায়শ্চিত্ত, অগ্নি, খাদ্যলাভে, বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি, যজ্ঞবেদী, আহুতি প্রভৃতির মতো সাধারণ পার্থিব বিষয়বস্তুও কিছু কিছু সূক্তে বিধৃত হয়েছে। প্রথম সাতটি অধ্যায় এবং বিংশতিতম অধ্যায়ের ঋগ্বেদের বহুসংখ্যক সূক্ত থেকে ঋণ গৃহীত হয়েছে—যা সাধারণভাবে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রথম, অষ্টম ও দশম মণ্ডল থেকে সংকলিত।

বিষয়বস্তু (অথর্ববেদ সংহিতা)

আনুষ্ঠানিক কারণে অথর্ববেদের বিষয়বস্তু অসংখ্য 'গণ'-এ বিভক্ত হয়েছিল; যেমন–অভয়, রৌদ্র, বাস্তু, অভিষেক, অপরাজিত, কৃত্যা, স্বস্ত্যয়ন, দুঃস্বপ্ন-নাশন, আয়ুষ্য, মৃগার ইত্যাদি। স্পষ্টতই এ ধরনের বিভাজন কখনই সম্পূর্ণ কিংবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না; তাই এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণী প্রায়ই সংলগ্ন হয়ে থাকে এবং ফলস্বরূপ গণগুলিকে আমরা বিষয়বস্তুর সাধারণ বর্গীকরণ রূপেই গ্রহণ করতে পারি।

মোট কুড়িটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছয়টি এবং অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়ের সূক্ত রয়েছে যাদের উপজীব্য বিষয়বস্তু হ'ল শত্রু, দানব ও

রাক্ষসদের বিতাড়ন করা, বিভিন্ন ব্যাধির, নিরাময় করা, (যেমন রক্তপাত বন্ধ করা, শিরাবন্ধনী, কৃমি, গলগণ্ড, ক্ষয়রোগ, শ্লীপদ, পাণ্ডুরোগ, সর্পদংশন প্রভৃতি)। পিতৃগৃহ-নিবাসিনী বঞ্চিতা ও বয়স্কা অনূঢ়া নারীদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রার্থনা ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘজীবন এবং পর্যাপ্ত ও সময়মত বৃষ্টিপাত, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, সামরিক অভিযানে রাজার বিজয়, রাজা ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর কল্যাণ, নির্মীয়মাণ গৃহের মঙ্গলবিধান, কৃষিকার্য, গোসম্পদ, বৃক্ষলতা, প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধি, বীরপুত্রের জন্ম, পারিবারিক শান্তি, গূঢ় বিদ্যা ও পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান এবং সর্বোপরি জীবনের সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে মুক্তি। সপ্তম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক কল্যাণ সম্পর্কেই অধিক আগ্রহ; এর বহু সূক্তে আত্মা, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের মতো বিমূর্ত ভাবনা রূপায়িত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব–উভয়বিধ বিষয়ই রয়েছে। তাই, এখানে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে বহু সূক্ত দেখি–মধুবিদ্যা, অতিথিপরিচর্যা, পঞ্চৌদন অজ, গার্হস্থ্য শ্রী-সম্পদের আকাঙক্ষা, ক্ষয়রোগ নিবারণের জন্য প্রার্থনা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাযুক্ত ‘অস্যবামীয়’ সূক্তটিও এখানে ঋগ্বেদ থেকে উৎকলিত হয়েছে। এছাড়া দশম ও একাদশ অধ্যায়ের সূক্তগুলির বিষয়বস্তু : খাদ্য, শত্রুবিনাশ, বিষের প্রতিষেধ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, জয়লাভের জন্য রক্ষা-কবচ-বন্ধন, ব্রহ্মচর্য, শতান্নদায়ী গোধন, ব্রাহ্মণের উদ্দেশে খাদ্যদান, বন্ধ্যা ধেনু, যজ্ঞদক্ষিণার গোধন এবং বিশ্বজগতের মূলাধার-স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁর বিষয়ে একটি ও ‘প্রথম ব্রহ্ম’ বিষয়ে আর একটি সূক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়ের দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূক্ত হ’ল মাতা পৃথিবীর প্রতি নিবেদিত ভূমিসূক্তটি এবং তা সমগ্র অধ্যায়ের তিন-চতুর্থাংশের অধিকস্থান অধিকার করে রয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্য তিনটি সূক্তের বিষয়বস্তু

ক্ষয়রোগ, স্বর্গপ্রদ(?) খাদ্য, যজ্ঞদক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণের প্রতি দাতব্য ধেনু এবং বশা গবী বা বন্ধ্যা গাভী। ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে আমরা ভিন্ন ধরনের সম্পাদনা কার্যের নিদর্শন পাই। বিষয়বস্তুর চরিত্রের দিক দিয়ে এইগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বেশি–ত্রয়োদশ অধ্যায়টিতে অবশ্য সম্পূর্ণতই আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু। চতুর্দশ অধ্যায়টি প্রধানত বিবাহ সূক্তের সংকলন, যেগুলির অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। অষ্টাদশটি সূক্তের সমাহার পঞ্চদশ অধ্যায়টি 'ব্রাত্যখণ্ড' -রূপে পরিচিত। ষোড়শ অধ্যায়ে মুখ্যত দুঃস্বপ্ন বিনাশ করার জন্য যমদেবের প্রতি প্রার্থনা জানানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়ে দুটি ভিন্নধ্যমী অংশ রয়েছে; গদ্যে রচিত প্রথম অনুবাকে রাজকীয় অভিষেক বিবৃত হয়েছে, অন্য দিকে পদ্যে বিন্যস্ত দ্বিতীয় অংশটি দুঃস্বপ্নের প্রতিরোধকল্পে প্রযুক্ত–অপটু সম্পাদনার ফলে একই অধ্যায়ে এই দুটি অংশ গ্রথিত হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে আদিত্যের উদ্দেশে একটি সূক্ত রয়েছে, অন্যগুলি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত। এছাড়া, 'বৈষাসহি'র প্রতি একটি সূক্তে বেদবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের অভ্যর্থনা, দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা এবং সূর্যগ্রহণের সময়ে সুরক্ষা রীতি বিবৃত হয়েছে। সমগ্র অষ্টাদশ অধ্যায় পিতৃপুরুষদের জন্য নিবেদিত অনুষ্ঠানে পূর্ণ; ঋগ্বেদের একটি সূক্ত প্রায় সম্পূর্ণভাবে এবং দশম মণ্ডলের অন্তর্গত দশম থেকে সপ্তদশ সূক্ত সামান্য পরিবর্তন সহ এতে গৃহীত হয়েছে। ষষ্ঠ ও অষ্টম মণ্ডল থেকেও কিছু কিছু ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। আহুত দেবতাদের মধ্যে যম ও অগ্নিই প্রধান। ঋগ্বেদের সূক্ত ও মন্ত্র বিন্যাসক্রম এখানে মাঝেমাঝে পরিবর্তিত হয়েছে।

অথর্ববেদের উনবিংশতি ও বিংশতিতম অধ্যায় দুটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উনবিংশতিতম অধ্যায়ে বিবিধ নূতন বিষয় ও নানা ভাববস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে; যেমন-যজ্ঞ, সিন্ধুগণ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, বিশ্বজগতের বীজ, পুরুষ, নক্ষত্রমণ্ডলী, বশিষ্ঠ, 'একবীর' বা প্রধান বীর,

ছন্দসমূহ, অথর্বা, স্বর্ণময় রক্ষাকবচ-বন্ধন, ওষধি ও প্রস্তরনিমিত বিবিধ রক্ষাকবচ, রাত্রি, মহাকাল, বেদমাতা এবং পরমাত্মা। বিংশতিতম অধ্যায়টি প্রধানত ঋগ্বেদ থেকেই সংকলিত; প্রথম পনেরটি সুক্তে ঋগ্বেদের বিবিধ কবির দ্বারা ইন্দ্র আহূত হয়েছেন। আবার একশ সাতাশতম সূক্ত থেকে একশ ছত্রিশতম সূক্ত কুন্তাপসূক্তরূপে পরিচিত এবং এদের অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত। বাকি সূক্তগুলি স্বভাববৈশিষ্ট্যে নিগূঢ় রহস্যে পূর্ণ; এগুলি শুধু শৌনকপাঠেই পাওয়া যায়, পৈপ্পলাদ পাঠে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বৈদিক ঐতিহ্যে অথর্ববেদের অস্বীকৃতি

বৈদিক যুগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অথর্ববেদকে সংহিতাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আমরা 'ত্রয়ী' ত্রিবেদ ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দের উল্লেখ পাই তাতে সংহিতারূপে ঋক, যজু ও সাম মন্ত্রের সংগ্রহের কথাই বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ সাধারণত পৃথকভাবে অন্য তিনটি বেদ কিংবা সামগ্রিকভাবে ত্রয়ীর উল্লেখ করলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে ঋক, যজু, সাম এবং অথর্বাঙ্গিরসের উল্লেখ করেছে। এই গ্রন্থে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস এবং পুরাণের উল্লেখ আছে। কিন্তু অসংখ্য প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং অঙ্গিরস বেদের সঙ্গে সঙ্গে সাপবিষয়ক লোকগাথা, দেবজন উপাখ্যান, ইন্দ্রজাল, ইতিহাস ও লোকশ্রুতি উল্লিখিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অথর্ববেদের উপনিষদগুলি ত্রয়ীর সঙ্গে অথর্ববেদের উল্লেখ করেছে; অবশ্য গোভিল, খাদির, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র অথর্ববেদের উল্লেখও করে নি। অনুরূপভাবে যজুর্বেদের বাজসনেয়ী ও মৈত্রায়ণী সংহিতা, ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ বা সামবেদের লাট্যায়ন স্রোতসূত্র অথর্ববেদের উল্লেখ করে নি। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে 'অথর্বাঙ্গিরস' কথাটি আছে এবং এককভাবে 'অঙ্গিরস' শব্দটি আছে

তৈত্তিরীয় সংহিতায়। বিপুল বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদ সম্পর্কে অপযশ প্রচলিত ছিল, যদিও পরবর্তী সাহিত্যে চতুর্বেদের অন্যতম যথার্থ সংহিতারূপে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অথর্ববেদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণ কি? অথর্ববেদের বিষয়বস্তু পরীক্ষা করার পূর্বে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্য তিনটি বেদের মধ্যে অনুষ্ঠানগতভাবে পরিচ্ছন্ন একটি পরিকল্প বিদ্যমান ছিল,– হা োতা আবৃত্তি করতেন, উদগাতা গান গাইতেন এবং অধিবর্ষ অনুষ্ঠানটি হাতেকলমে নিস্পাদন করতেন। সাহিত্যগত শ্রেণীবিচারের দিক দিয়ে বৈদিক সাহিত্য সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ ছিল ঋগ্বেদ আবৃত্তির উপযোগী কাব্য, সামবেদ সংগীতের জন্য স্তোত্র এবং যজুর্বেদ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ধর্মানুষ্ঠানকেন্দ্রিক গদ্য নির্দেশাবলী সরবরাহ করত। কোনো কোনো ভারতীয় পণ্ডিত এই চিরাগত ধারণা পোষণ করেন যে, প্রাগুক্ত ত্রিবিধ রচনাই ত্রয়ী শব্দের তাৎপর্য এবং অথর্ববেদ যেহেতু গদ্যপদ্যময় সংহিতা, সেটিও ত্রয়ীর বহির্ভূত নয়। অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে অন্তরঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, এই সংহিতাব অধিকাংশ সূক্তই নুতন বিষয়ভিত্তিক, যা ঋগ্বেদের ভাববৃত্তের তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব। এটা সত্য যে, ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে এই ধরনের কিছু কিছু বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, কিন্তু এগুলির সংখ্যা খুবই কম এবং তাও আবার সেই সংহিতার অন্তিম পর্যায়েই খুঁজে পাওয়া যায়। নূতন বিষয়বস্তুকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বর্গীকরণ করতে পারি : (ক) গার্হস্থ্য ও নারীবিষয়ক (খ) সামাজিক ও পারিবারিক (গ) পিতৃপুরুষ বিষয়ক (ঘ) রাজকীয় ও সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়শ্রেণী সংক্রান্ত এবং (ঙ) রহস্যময় ও ঐন্দ্রজালিক বিষয় সম্পর্কিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, গৃহ, নারী, রাজা ও সৈন্য এখন মনোযোগের কেন্দ্র-বিন্দুতে, এবং দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ইন্দ্রজালের উপযোগী।

এই সমস্ত বিষয়ের অধিকাংশ নিশ্চিতভাবে সূচনা থেকেই ছিল। ধর্মীয় ইতিহাসের আধুনিক গবেষকগণ ইন্দ্রজালকে ধর্মের তুলনায় প্রাচীনতর বা পরবর্তী ব'লে ভাবেন না, তাদের মতে এই দুটি সমকালীন। পুরোহিত ও ঐন্দ্রজালিকের নিকট একই সমস্যা ছিল অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তির সামনে অসহায়তার বোধ; এই দুজনেরই লক্ষ্য একই—প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে প্রকৃতির বৈরী শক্তির মধ্যেও অস্তিত্ব রক্ষা করার উপায় তারা আবিষ্কার করতে পারে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পুরোহিতের কার্যকলাপে যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, তাতে দেখা যায় তিনি নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠান করছেন, বিভিন্ন প্রার্থনা ও মন্ত্র আবৃত্তি এবং অথবা এমন গান করছেন যাতে প্রার্থীর পক্ষ থেকে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেবতার প্রসন্নত কামনা করা হয়। অন্যদিকে জাদুকর বা শামানেরা যে ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাতে জাদুশক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো গূঢ় মন্ত্র জপ করা হ'ত।

ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে উপস্থিত :

(ক) ধ্বংসের আশঙ্কা এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আকাঙক্ষা। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক পোল রদ্যাঁর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে; ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্যরূপে তিনি খাদ্য সরবরাহ, ব্যাধি ও মৃত্যু নিবারণ, নারীদের অসুস্থতা এবং মৃত্যুভীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তার সিদ্ধান্ত এই যে, ধর্ম ও ইন্দ্রজাল সমব্যাপী ও সমকালীন; ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয় নি।

(খ) অন্য একটি ব্যক্তি অর্থাৎ পুরোহিত বা জাদুকরের মধ্যস্থতা।

(গ) কোনো মন্ত্র বা গুঢ় শক্তিসম্পন্ন জাদু শব্দের আবৃত্তি।

(ঘ) নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা। একমাত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রেই পারস্পরিক পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ কোথাও নির্দিষ্ট কোনো দেবতার সুবিন্যস্ত ভূমিকা এবং অন্যত্র তার অনুপস্থিতি।

অন্য তিনটি সংহিতা অর্থাৎ ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ একটি সুসামঞ্জস সামগ্রিক সাহিত্যরূপে গড়ে উঠেছে, কেননা ঋগ্বেদে রয়েছে আবৃত্তিযোগ্য সূক্ত, সামবেদে সংগীতোপযোগী মন্ত্র এবং যজুর্বোেদ জপনীয় পাঠ ও প্রধান শ্রৌতি-যাগসমূহ অনুষ্ঠানের জন্যে নির্দেশাবলী। খুব স্বাভাবিকভাবেই। অথর্ববেদ এই সাহিত্যাবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নয় : এর সূক্তগুলি প্রধানত গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, নারী, রাজা, সৈন্য, রুগ্ণ ব্যক্তি, কৃষিজীবী এবং গৃহস্বামীর প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাছাড়া, খাঁটি অথর্ববেদীয় মন্ত্রগুলির জন্য দেবতারা কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে বহু দেবতার নাম সংযোজিত হয়েছিল, সুতরাং লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অথর্ববেদ অন্য তিনটি বেদের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। অথর্ববেদের প্রধান বিষয়বস্তুগুলি সাধারণত ঋগ্বেদের মন্ত্রকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

পশুপালক সমাজ সাধারণত অন্যবিধ কায়িক শ্রমের অর্থাৎ কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে; তাই প্রাথমিকভাবে বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত বৈশ্যশ্রেণীর প্রতি উপেক্ষই প্রদর্শিত হয়েছে–কেননা পশুপালক আর্যদের নিজস্ব আচরণবিধি অনুযায়ী প্রগুক্ত দুটি বৃত্তিই ছিল মর্যাদাহানিকর। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে অথর্ববেদ সংকলিত হওয়ার সময়ে আর্যরা কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন,–পশুপালন তখন তাদের আয়ের গৌণ ও পরিপূরক একটি উৎস, কখনো কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যও তার পরিপূরক। উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তর বিধানে কৃষিকার্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় পরিবর্তনের ফলে উপরি সংগঠনে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত অনুরাপ কোনো স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়

নি। ভূমিকর্ষণের প্রতি পশুপালক সমাজের অন্তর্গূঢ় বিতৃষ্ণা আরো দীর্ঘকাল অবধি অব্যাহত ছিল; বৈদিক সাহিত্য সংকলনে অথর্ববেদ যে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, তার জন্যেও এই বিতৃষ্ণার মনোভাবও অংশত দায়ী। ভেষজবিদ্যাকেও অগৌরবজনক ভেবে তাচ্ছিল্য করা হত; পরবর্তীকালের রচনাগুলিতে এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬ : ৪ : ৯; ৩), মৈত্রায়ণী সংহিতা (৪ : ৬ : ২) এবং শতপথ ব্রাহ্মণ (৪ : ১ : ৫ : ১৪) গ্রন্থে এ ধরনের বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদে যেহেতু ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য বিপুল সংখ্যক মন্ত্র রয়েছে,-সুদূর প্রাচীন কাল থেকে জাদুকর চিকিৎসকরা আরোগ্যের জন্য নানারকম ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সময়ে সম্ভবত এইসব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন–এদের প্রতি সংস্কৃতিসচেতন প্রাচীন আর্য পুরোহিতরা যে ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন তা সহজেই অনুমেয়। ওষধিযুক্ত রক্ষাকবচ ও বিশেষ-নামযুক্ত প্রস্তর উল্লিখিত হয়েছে ব্যাধি, দানব এবং বিবিধ সামাজিক ও পারিবারিক অমল প্রতিরোধ করার উপায় হিসেবে। এমনকি কখনো কখনো সংকটকালে রাজারও অলৌকিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিত এবং এইসব জাদুকর চিকিৎসকরা ইন্দ্রজালের অনুষ্ঠানের দ্বারা তারা ইষ্টসিদ্ধির ব্যবস্থা করতেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র বা আয়ুর্বেদের প্রাথমিক সূত্রপাত হয়েছে ভৈষজ্য' অংশে যেখানে ব্যাধি ও চিকিৎসা পদ্ধতি বিবৃত। অথর্ববেদের অন্যতম শাখা চরণবৈদ্যকে যে চরকসংহিতার লুপ্ত উৎসরূপে মনে করা হয়ে থাকে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। আনুষ্ঠানিক নির্দেশগুলি বা বিনিয়োগগুলিতে আমরা লক্ষ্য করি যে, ওষধি, ধাতু এবং রাসায়নিক পদার্থ। ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হত; শিশু-চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসার উপাদানগুলি খুবই প্রাথমিক স্তরে হলেও বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে মৈত্রী উপনিষদেও চিকিৎসকদের পক্ষে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে। অথর্ববেদের অস্বীকৃতির এটিও একটি কারণ, এতে চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু মন্ত্র রয়ে গেছে।

অথর্ববেদে গৃহ ও নারীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব'লেই তারই মধ্যে আমরা পরবর্তীকালে গৃহ্যসূত্রগুলির পূর্বাভাস লক্ষ্য করি। এই বিশেষ শ্রেণীর রচনা অন্যান্য সংহিতাগুলির গণ্ডী-বহির্ভুত, যেহেতু সেইসব সংহিতা মুখ্যত প্রধান শ্রৌতযাগগুলির বিবরণ দিয়েছে, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে নারীর ভূমিকা উপেক্ষিত হলেও রাজার ভূমিকার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদেই বিশেষভাবে অভিষেক ও যুদ্ধাভিযান-বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজা ও সৈন্যবাহিনীর উপর এই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাজা ও সৈন্যবাহিনীর উপর এই গুরুত্ব আরোপের কারণ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষদিকে উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান এবং কিছু কিছু সঙঘবদ্ধ রাজ্য থেকে ক্রমশ বৃহত্তর রাজ্য ও পরে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী বৈদিক যুগের সূচনাপর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের রাজারা ধীরে ধীরে গৌরব ও শক্তি অর্জন করছিলেন। এই পর্যায়ে রচিত অথর্ববেদের মধ্যে রাজার শুরুত্ব শুধু বৃদ্ধিই পায় নি, অভিষেক-সংক্রান্ত রাজসূয় যজ্ঞ এক রহস্যময় ও প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছিল। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, রাজসূয় যজ্ঞে কিছু কিছু আদিম অনুষ্ঠানের প্রতীকায়ন ঘটেছিল—সম্ভবত মহাবিশ্বের পুনর্নবীকরণের উদ্দেশ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে যে সমস্ত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হত, তাদের সংক্ষেপিত রূপান্তর রাজসূয় যজ্ঞে অভিব্যক্তি। অভিষেক সূক্তগুলি ভাবাদর্শ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিনব নয়; ঋগ্বেদে প্রাপ্ত রাজসূয় বা বাজপেয় সম্পর্কিত অন্তর্বস্তুরই ধারারাহিক ও বিশদীকৃত রূপ। কিন্তু সৈন্যদের কল্যাণকামনা, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি নতুন ভাববস্তু, কেননা এই ইন্দ্রজাল প্রায় সামগ্রিকভাবেই অথর্ববেদীয়।

সাধারণত 'অথর্বন্' ও 'অঙ্গিরস্' শব্দ দুটি যদিও অগ্নিদেবের পুরোহিত সম্প্রদায়কেই বোঝায়, প্রকৃতপক্ষে এ দুটি ভিন্ন ধরনের ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। অথর্ব চিকিৎসাবিষয়ক এবং কল্যাণপ্রসূ বা নির্মল ইন্দ্রজাল পরিচালনা করতেন। এর মধ্যে ছিল শারীরিক কুশলের ও স্বাস্থ্যের জন্য

ইন্দ্রজাল (ভৈষজ্য), চিকিৎসা সম্পর্কিত (পৌষ্টিক), সাধারণ পারিবারিক কল্যাণ ও সৌষম্যের জন্য ইন্দ্রজাল (সাংমনস্য) রাজকীয় অনুষ্ঠান (রাজকর্মাণি) এবং সমৃদ্ধির জন্য স্ত্রীআচার (স্ত্রী কর্মাণি)। পরবর্তীকালে রচিত ধর্মসূত্রগুলি এইসব বিষয়কেই যথেষ্ট মর্যাদা দান করেছে; অবশ্য সেই সঙ্গে এইসব গ্রন্থ ঐন্দ্রজালিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করেছে। ঋগ্বেদের সময় থেকে যে জাদুবিদ্যা নিন্দিত, অঙ্গিরার সঙ্গে তাই সম্পৃক্ত; একে প্রধানত অভিচার বা কৃত্যা বলে অভিহিত করা হয়–এর বিভিন্ন উপরিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে মারণ, উচাটন, সম্মোহন ও বশীকরণ। অভিচার বা কৃত্যা প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বিমুখী অনুষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে কৃত্যাপ্রতিহরণ বা শত্রুর জাদুক্রিয়াকে নিস্ক্রিয় করার উপযোগী, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, যাকে আবার কৃতাদূষণ অধ্যায়ে নিন্দা করা হয়েছে। ঋষি অঙ্গিরার সাধারণ বিশেষণ হ'ল 'ঘোর' বা ভয়ংকর। অথর্ববেদের পঞ্চম কল্পকে অঙ্গিরস কল্প (বা যাতু, অভিচার বা বিধানকল্প) বলা হয়েছে, এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে "অঙ্গিরস' শব্দটি কৃষ্ণ বা ভয়ংকর ইন্দ্রজালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই অংশে যাতু বা দানবদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি লাভ করার জন্য মন্ত্র এবং কিছু কিছু স্ত্রী-আচারের মন্ত্রও আছে।

অথর্ব পরিবার অপেক্ষা অঙ্গিরা পরিবারের সঙ্গেই ভৃগুর সম্পর্ক বেশি। মৈত্রায়ণী সংহিতায় এই তিনটি নাম অর্ধদেবতাররূপে বর্ণিত; আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অঙ্গিরা এবং ভৃগু এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় অথর্ব দেবতারূপে গৃহীত হয়েছেন। পরস্পর-সংবদ্ধ এই তিনটি পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরাই অথর্ববেদের রচয়িতা। অথর্বা এবং অঙ্গিরা উভয়েই অগ্নিচর্যার পুরোহিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এই যে দ্বৈত বোধ, শুভ ও অশুভ ফলদানের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে, তার উৎস প্রাচীন ইন্দোইরাণীয় পর্যায়ে আবিষ্কার করা যায়। বস্তুত, ঋগ্বেদের সময়েই অগ্নির দুটি স্পষ্ট রূপভেদ

লক্ষণীয়। একদিকে তিনি শুভপ্রদ হিব্যবাহন ও হিব্যাৎ আবার অন্যদিকে অশুভ ক্রব্যাৎ-সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, অগ্নি প্রাথমিক পর্যায়েই দ্বিবিধ কার্যকলাপ ও অনুষঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছিলেন। অবেস্তায় অগ্নির বিশেষ গুরুত্বের কথাও আমাদের মনে পড়ে; ঐ গ্রন্থে শবদাহে অনুমোদিত নয়, যেহেতু অশুচি শবদেহের সংস্পর্শে অগ্নির মালিন্য দোষ দেখা দেবে, এই তাদের আশঙ্কা। ভারতীয়দের শবদাহপ্রথায় অগ্নি যেহেতু অশুচি শবের সংস্পর্শে দূষিত হয়—ইরাণীয়রা তাই অঙ্গিরার প্রতি বিদ্রুপ বর্ষণ করেছে এবং নিজেদের অগ্নিবিষয়ক পুরোহিতকে শুভসূচক অথর্ব বলে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে। ধর্মসূত্রগুলি মাঝে মাঝে অথর্ববেদের প্রতি পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছে, কেননা একদিকে তারা যদিও অথর্ববেদকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিহার্যারোপে স্বীকার করে নিয়েছে, অন্যদিকে আবার বিষয়বস্তুর বিচারে তাকে অপবিত্র, অপধর্মীয় ও ঐন্দ্রজালিক কার্যকলাপ উপস্থাপিত করার অপরাধে সাধারণভাবে অপকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেছে। এই সব গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, অথর্ববেদের ক্রিয়াকর্ম সাধারণভাবে শাস্তিযোগ্য। ইন্দ্রজাল ও পুরোহিততন্ত্র যেহেতু পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সমস্ত আদিম এমনকি বহু উন্নত ধর্মেও এদের সহাবস্থান লক্ষণীয়-তাই আমরা এমন একটি সময়পরিধি কল্পনা করতে পারি যখন শামান ও জাদু চিকিৎসক পাশাপাশি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করত। বৃহৎ ঐতিহ্য যজ্ঞীয় ধর্ম ব্যাপকতর হওয়ার পর যখন পবিশীলিত স্তোত্র-সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল এবং এমন একটি দেব-সঙ্ঘের বন্দনা করা হ'ল যেখানে দেবতাদের সুনির্দিষ্ট অবয়ব ও কার্যকলাপের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে—তখন লঘু ঐতিহ্যের শামান পুরোহিতদের নিকৃষ্ট অবস্থানে অবনমন ঘটল। স্পষ্টতই অথর্ববেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির সঙ্গে দেবতাদের কোনও সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। অন্য সমস্ত প্রকৃত জাদুবিদ্যার মতো তারাও প্রত্নকথা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান ও মায়ার সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। বহু কাল পরে অথর্ববেদ যখন রক্ষণশীল বৃহৎ ঐতিহ্য

দ্বারা স্বীকৃত হল, পুরোহিতরা এবং ঋগ্বেদের সূক্তগুলি সমগ্রত কখনো অপরিবর্তিত এবং কখনো বা বিকৃতভাবে অথর্ববেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত হয়েছে; তখনই প্রত্যেক সূক্তের সঙ্গে এক বা একাধিক দেবতার সম্পর্ক স্থাপনের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিকে অনুকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রচলিত পাঠে বহু সূক্তের দেবনাম ও সূক্তের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা থেকে তা প্রমাণিত। বহু ক্ষেত্রে 'মন্ত্রোক্ত দেবতা" বলে দেবতাদের অনির্দিষ্ট অবস্থায় রাখা হয়েছে। কৃমি বিনাশের জন্য একটি সূক্তে দেবতারূপে ইন্দ্রের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে বহু উদ্ভট উদাহরণের অন্যতম, যেখানে সংহিতা-বিষয়ক নিয়মের একেবারে যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটেছে। যে কোনও স্বীকৃত সংহিতায় প্রতিটি সূক্তের এক বা একাধিক দেবতা, একজন কবি, একটি নির্দিষ্ট ছন্দ এবং যথার্থ আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ বা বিনিয়োগ থাকবে এই হ'ল নিয়ম; এই নিয়মের যান্ত্রিক অনুকরণ সত্ত্বেও অধিকাংশ অথর্ববেদীয় সূক্তেরই নিগুঢ় স্বভাবধর্ম অনুযায়ী এই সব বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু, এই নিয়মটি গৃহীত হওয়ার পর স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভের জন্য যে আকাঙক্ষার সৃষ্টি হ'ল, তারই ফলে প্রতি সুক্তের শীর্ষে নিয়মমাফিক এইগুলি সন্নিবেশিত হ'ল। এইভাবে যা কিছু মূলত জাদু পুরোহিতের উপযোগী জাদুক্রিয়া বা প্রেতনিবারক অনুষ্ঠান ছিল, তাই এখন ঋগ্বেদীয় সূক্তের অনুকরণে বৃহৎ ঐতিহ্যের ভূমিকা আত্মসাৎ করে নিল। তবে মনে রাখতে হবে যে, ঋগ্বেদের অন্তিম পর্যায়ের রচনা-প্রথম ও দশম মণ্ডলেই-তা সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল। সেখানকারী কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য অথর্ববেদের কথাই মনে করিয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে কিছু কিছু অথর্ববেদীয় সূক্ত-ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও—স্বভাববৈশিষ্ট্যে ঋগ্বেদতুল্য।

সুতরাং যুক্তিসহ অনুমান এই যে, বেশ কিছুকাল, সম্ভবত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বৃহৎ ও লঘু ঐতিহ্য সহাবস্থান করেছিল। শ্রৌতযাগ বৃহৎ ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত, — তার মধ্যে সমুন্নত প্রত্নকথাভাণ্ডার, আনুষ্ঠানিক সাহিত্য ও পুরোহিততন্ত্র

ছিল; জনসাধারণের সামূহিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা তার বিষয়-পরিধির অন্তর্গত। কোনো সুনির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ, ধর্মতত্ত্ব বা প্রত্নপুরাণ অথর্ববেদ না থাকার কারণ মূলত তা সম্পূর্ণভাবে দেবসংস্রবমুক্ত ছিল। মন্ত্রগুলি কখনো কখনো নিগুঢ় রহস্যপূর্ণ এবং অদীক্ষিতের কাছে অর্থহীন বাগাড়ম্বর বলে প্রতিভাত।

বৃহৎ ঐতিহ্যের পুরোহিতগণ কিছুকাল পৃষ্ঠপোষকসুলভ মনোভাব নিয়ে লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্গত ধর্মাচরণকে মেনে নেওয়ার পরে এমন একটা সময় এল, যখন প্রাচীনপন্থী পুরোহিতরা জাদুকর-চিকিৎসকের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রুপ প্রদর্শণের পরিবর্তে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় যোগদান না করে, পরভোজী শ্রেণীরূপে এরা প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্য ভোগ করতেন। ফলে এঁরা সেই জাদুকর-চিকিৎকদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছিলেন, যাঁরা প্রচলিত দেবকাহিনী বা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও যজমানদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করত।

প্রধান সামাজিকে শ্রেণী-বিভাজন অবশ্য ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও শামানের মধ্যে। এটা যথার্থ যে, এই দুই শ্রেণীর পুরোহিতদের কার্যক্ষেত্র ছিল পরস্পর ভিন্ন; তবে, প্রাচীনপন্থী পুরোহিতদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, যজমানের যজ্ঞীয় দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাই এই দুই ধরনের ধর্মচর্যা ও পুরোহিতসম্প্রদায়ের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কার্যাবলীর ফলে তাদের উপার্জনযোগ্য ধন অকারণে বিভাজিত হচ্ছে। এরই ফলে অথর্ববেদকে সংহিতা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদ বাড়ল; ত্রয়ী হল চতুষ্টয়ী : অথর্ববেদেয় পুরোহিতকে ‘ব্রহ্মা’ নামে অভিহিত করে যজ্ঞে বিশেষ স্থান দান করা হ’ল। তবে যজ্ঞানুষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্ব যেহেতু ইতিমধ্যে হোতা, উদগীতা, অধ্বর্যু এবং তাদের সহকারীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাই

ব্রহ্মাকে দূরে উপবিষ্ট অবস্থায় সমগ্র যজ্ঞটি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল,– অনুষ্ঠানের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠানের বিধান দিতেন। এই দায়িত্বভার গ্রহণ করার পূর্বে ব্রহ্মাকে প্রচলিত শাস্ত্র শিক্ষা করতে হাত; কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে অথর্ববেদের নিজস্ব রচনাকে মূল ধারার সঙ্গে সংযোজিত করে দক্ষিণার সিংহভাগ গ্রহণ করতেন,– রাজপুরোহিতরূপে ব্রহ্মার শ্রেণীগত অবস্থানের ফলেই তাকে তা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব ছিল না। তবে, ব্রহ্মার ভূমিকার গুরুত্ব সমাজে অনেক বিলম্বে উপলব্ধ হয়েছিল।

অথর্ববেদেব পরিপ্রেক্ষিতে যে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রতিবাদী লোকাতীত শক্তিকে নিরপেক্ষ করে তোলে–ব্রহ্মা তারই মানুষী রূপ। অবশ্য বৃহৎ ঐতিহ্যের অন্তর্গত পুরোহিতরাও যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে এই শক্তির ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন–পরবর্তীকালে এর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানে যজমানের পক্ষ থেকে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ-কামনায় উচ্চারিত মন্ত্রসমষ্টি থেকে উদ্ভূত শক্তিকে তঁরা 'অপূর্ব' আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রজালের সম্পর্ক বিষয়ে পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। দেবশক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াই লোকাতীত শক্তিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার যে খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন, তারই ফলে ব্রহ্মার উন্নততর মাধ্যাত্মিক অবস্থান এবং যজ্ঞবিদ্যা সম্পর্কে সমৃদ্ধতির জ্ঞান সমাজে স্বীকৃত ছিল বলে যজ্ঞ পর্যবেক্ষক পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। একদিকে হাোতা, উদগাতা ও অধ্বযু এবং অন্যদিকে ব্রহ্মার ভূমিকার কল্যাণে সামূহিক ও গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বৃহৎ ও লঘু ঐতিহ্যের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে 'ব্রহ্মা' পুরোহিতদের সামাজিক প্রতিপত্তি বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমূর্ত আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রতীক 'ব্রহ্মন' (ক্লীবলিঙ্গ)-এর গৌরবও বর্ধিত হল। এই ব্রহ্মা বৈদিক যুগের চূড়ান্ত পর্বে বহু বিলম্বে

দেবসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে,–এই অংশটি বহু বিমূর্ত ভাবকেন্দ্রিক অথর্ববেদীয় সূক্ত রচিত হওয়ার পর্যায়ের সমকালীন।

উন্নতিশীল পশুপালক সমাজে একক পরিবারের কর্তা পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করতেন; অন্যদিকে গোষ্ঠীপতি ছিলেন একান্নাবর্তী বৃহৎ পরিবারের পুরোহিত। আবার গ্রামীণ জাদুকর-পুরোহিত সমগ্র গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধর্মীয় আচরণগুলি পরিচালনা করতেন। কৃষিব্যবস্থার পত্তন হওয়ার পরে উদ্বৃত্তি সম্পদ যখন আরো বর্ধিত হ'ল,–কায়িক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন ও অবকাশযুক্ত পুরোহিতশ্রেণীর উত্থান দেখা গেল। বৃহৎ ঐতিহ্যে জাদুকরপুরোহিতকে মূলত এককভাবে, মাঝে মাঝে এক বা দুজন গৌণ সহকারীর সাহায্যে, কার্যভার পরিচালনা করতে হত। যাজকতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের অন্তিম পর্যায়ে অথর্ববেদীয় পুরোহিত যখন মূল যাজকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন তখন ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরভিন্ন পৌরাহিত্য-প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নতুন ধরনের সমন্বয় ও সংমিশ্রণের প্রবণতা দেখা দিল। অবশ্য এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে শামানেরা যজ্ঞীয় সাহিত্য অধিগত করে নিয়েছিলেন; এদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত অনার্য ব্রাত্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের রহস্যগুঢ় রচনাসম্ভারের সাহায্যে বিমূর্ত ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার একটি প্রবণতা গড়ে তুলেছিলেন। সুতরাং যে দীর্ঘ ঐতিহ্যের অন্তভাগে অথর্ববেদের অবস্থান, তার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ জাদুকরপুরোহিতগণ (শামান), যাজক সম্প্রদায় এবং রহস্যময় আধ্যাত্মিক (সন্ন্যাস) চিন্তাধারা।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও বিস্তারের ফলে বৈদিক ধর্ম যখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিল, খুব সম্ভবত তখনই অথর্ববেদ সংহিতা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরোহিতদের মধ্যে এই উপলব্ধি সঞ্চারিত হয় যে, ঐক্যবদ্ধ না হলে তাদের পতন অনিবার্য।

রক্ষণশীল ধর্মের সম্পদশালী পুরোহিতদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত ছিল বৈপ্লবিক ঘটনা এবং নিশ্চিতভাবে এতেই বৈদিক ধর্মের আয়ুষ্কাল বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল। প্রাচীন ধর্মচর্যার পরিধি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকেও জনসাধারণের কিছু কিছু অংশের সুখী ও তৃপ্ত জীবন যাপনের আশঙ্কাও সেখানে ছিল। জাদুকর চিকিৎসক যেহেতু তাদের গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যা সমাধান করে দিত, বিপুল ও ব্যয়সাধ্য প্রধান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি কোনও আকর্ষণ তারা বোধ করত না কিংবা তেমন সঙ্গতিও তাদের ছিল না। ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলের কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে যারা বাস করত তাদের মধ্যে বৃহৎ ঐতিহ্যে উল্লিখিত যজ্ঞের প্রভাব হ্রাসের লক্ষণগুলি অধিক প্রকট, কেননা রক্ষণশীল অঞ্চলের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মাচারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের প্রবণতা সর্বদাই অধিক পরিস্ফুট হয়। এটা আকস্মিক কোনো সমাপতন নয় যে, অথর্ববেদের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতই পূর্বাঞ্চলে মগধদেশে আর্যদের বসতি বিস্তারের প্রমাণ বহন করে, যেখানে অবৈদিক আদিম ধর্ম প্রচলিত ছিল। সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তী সন্ন্যাসী গোষ্ঠীগুলির উত্থান ও বিকাশের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। সম্ভবত, সমাজবদ্ধ জনসাধারণের যে বিপুল অংশ তখনও পর্যন্ত এইসব গোষ্ঠীপতিদের মতবাদকে অনুসরণ করত, তারা প্রধান শ্রৌতি-যাগগুলি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে মোহমুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় অবধি গার্হস্থ্য ও সামাজিক সংকট মুহূর্তে সম্ভবত তাঁরা শামানদের প্রয়োজন অনুভব করতেন। সুতরাং তৎকালীন ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে শামানদের এবং তদুপযোগী অথর্ববেদের ধর্মচিন্তাকে তখনও পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছিল যদিও শ্রৌতপুরোহিতরা ও তাদের যজ্ঞানুষ্ঠান তখন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পথে। ফলে শ্রৌতপুরোহিতদের কাছে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ইন্দ্রজালের প্রতি উপেক্ষার মনোভাবকে জয় করতে হবে; অথর্ববেদ ও তার পুরোহিতসম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক উপেক্ষার মনোভাবকে দূর করতে হবে

এবং পবিত্র সংহিতা-সাহিত্যের পরিধিতে ও আনুষ্ঠানিক আচার অনুশীলনের মধ্যে তার শাস্ত্র ও যাজকতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অস্তিত্বরক্ষার জন্য আপোষ মীমাংসার অনিবার্য কঠোর পদ্ধতিরূপে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

সংহিতা সাহিত্যে বিলম্বে সন্নিবেশিত অথর্ববেদের মধ্যে আমরা অধিকতর মাত্রায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে বিহার ও বাংলার বেলাভূমি অঞ্চলের বিবিধ প্রকার ব্যাধি-নামের সঙ্গে পরিচিত হই; ভাষাতাত্তিক নিদর্শন থেকেও বোঝা যায় যে, অথর্ববেদের অধিকাংশই অন্যান্য সংহিতার তুলনায় পরবর্তী কালের রচনা। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, অথর্ববেদের সূক্তগুলি কেবলমাত্র সেই সমাজেই রচিত হওয়া সম্ভব যা কৃষি ব্যবস্থা, বাণিজ্য, প্রশাসন, স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে এবং যার মধ্যে জটিল ও সুপ্রতিষ্ঠিত যাজকতন্ত্র বিদ্যমান। দক্ষিণার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং ব্রহ্মৌদন, ব্রহ্মাগবী ও পঞ্চৌদন অজ, বশ্য গবী ইত্যাদিব প্রয়োগ থেকে পুরোহিততন্ত্রের তুলনামূলকভাবে পরবর্তী পর্যায়েই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজা ও সৈন্য সম্পর্কিত সূক্তগুলি প্রতিষ্ঠিত রাজত্ব এবং প্রশাসন ও সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যবাহিনীর দিকে নির্দেশ দেয়।

এটা সত্য যে, অথর্ববেদের বিষয়বস্তু বহু অংশ যদিও প্রথম সংকলিত হয়েছে তবু এইগুলি নিশ্চয়ই আর্য জনগোষ্ঠীর নিকট দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত ছিল। সুতরাং উল্লিখিত ব্যাধিসমূহ, অপদেবতায় বিশ্বাস, বৃক্ষনাম, সর্প এবং কীটপতঙ্গের ভয়, সপত্নী সম্পর্কে উদ্বেগ, অনূঢ়া বৃদ্ধর উদ্বেগ ও হতাশা ইত্যাদি সমাজের চিরকালীন বিষয়। কিন্তু এই সংহিতায় তাদের উপস্থিতি থেকে পরবর্তীকালে এগুলির সংযোজনই প্রমাণিত হয়,–বিশেষত যখন শ্রৌত পুরোহিতরা বিরোধিতা ত্যাগ করে এই পাঠ ও বিবিধ সহগামী ধর্মর্ষোকে রক্ষণশীল ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা অনিবার্য বলে বুঝেছিল।

রচনাকাল (অথর্ববেদ সংহিতা)

অথর্ববেদের রচনাকাল সম্পর্কে যে কোনো বিবরণকেই কতকটা স্ব-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কেননা সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের তুলনায় অথর্ববেদ একই সঙ্গে প্রাচীনতর ও নবীনতর। সংহিতাপাঠের দিক দিয়ে সামবেদ তাৎপর্যহীন, যেহেতু পাঠগতভাবে এর অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অথর্ববেদের বিষয়বস্তু, বিশেষত তার ঐন্দ্রজালিক অংশটি সভ্যতার উষাকাল থেকে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ছিল; কিন্তু অথর্ববেদের বহু সূক্তই পরবর্তী কালে রচিত। আর্যরা তখন সদানীরা নদী অতিক্রম করে এতাবৎকাল পর্যন্ত নিষিদ্ধদেশ রূপে পরিচিত অঞ্চলে অর্থাৎ বিহার ও সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করেছিল। অথর্ববেদের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সেই ব্রাত্যগোষ্ঠীর উপস্থিতি– যাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বা বুদ্ধদেবের সমকালীন নাস্তিক্যবাদী ধর্মগোষ্ঠীর পূর্বসূরি-আধ্যাত্মিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার সূত্রপাত ঘটানোর অন্যতম কারণ ছিল। মগধে যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, বেদবহির্ভূত অরক্ষনশীল ধর্মমত প্রচলিত ও স্বয়ংশাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের সম্মিলিত সঙঘ বর্তমান ছিল—তা আর্যদের পরিচিত অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নতুন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, চিন্তাধারা ও প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান পরিচিতি এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী ও আন্দোলনের বিস্তারের ফলে সংহিতা রচনার পর্যায় সমাপ্ত হল। বৈদিক বিশ্ববীক্ষার দীর্ঘকাল-ব্যাপী ক্রমিক অবরোহণের পথে অথর্ববেদ সংহিতার সংকলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক।

সূক্তসমূহের শ্রেণী বিন্যাস

আমরা ইতোমধ্যে সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বর্গীকরণ করেছি : (১) শারীরিক কল্যাণ, (২) দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণ, (৩) পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ, (৪) রাজকীয় ও সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত, (৫) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সম্পর্কিত, (৬) সৃষ্টিতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক এবং (৭) ঐন্দ্রজালিক মায়া।

শারীরিক কল্যাণ বিষয়ক সুক্তিগুলিতে তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে যেসব ব্যাধির প্রকোপ দেখা যেত তার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে আছে ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ, ম্যালেরিয়া, সর্দি-কাশি, রক্তাল্পতা, গলগণ্ড, অন্ধত্ব, জ্বর, পাণ্ডুরোগ, কৃমি, কেশনাশ, বিভিন্ন রকমের ব্যথা এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পক্ষাঘাত। এইসব ব্যাধির অধিকাংশেরই মূলে রাক্ষস বা ভূতপ্রেত–এই বিশ্বাস তখন প্রচলিত ছিল।

এইজন্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান এদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হত এবং মন্ত্রগুলি প্রেতবিতাড়নের জাদুকৌশল ছিল বলে মনে হয়। রক্তপাত, অতিরিক্ত সোমপানজনিত ব্যাধি, শারীরিক যন্ত্রণা, উন্মত্ততা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, বিষক্রিয়া, সর্পদংশন, শিশুর দান্তোদগম প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া কিংবা প্রার্থনা প্রচলিত ছিল। বহু ঔষধি, ধাতব ও রাসায়নিক পদার্থ, গ্রহরত্ন, রক্ষাকবচ ইত্যাদির প্রস্তুতি ও প্রয়োগের জন্য নানাবিধ ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করা হত। এ সমস্ত বিষয়ের অধিকাংশই অথর্ববেদের নিজস্ব বিষয় নয়। কিন্তু শাস্ত্রে এদের অন্তর্ভুক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাস্ত্র রচনার মূলপর্ব যখন সমাপ্ত হতে চলেছিল, বৈদিক যুগের সেই অন্তিম পর্বেই এইগুলি সংকলিত।

বাস্তবজীবনের কল্যাণকামনায় প্রযুক্ত সূক্তগুলিই সংখ্যায় সর্বাধিক; এদের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘজীবন ও সম্পত্তির জন্য প্রার্থনা (আয়ুষ্য ও পৌষ্টিক), স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, বৃক্ষলতা ও প্রাণীসমূহের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা, আকস্মিক আঘাত, সর্প ও বিষাক্ত কীটের দংশন থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি। সাধারণভাবে এইসব প্রার্থনা নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যারা সুনির্মিত গৃহে বাস করত, কৃষির প্রয়োগিক দিকসম্পর্কে অবহিত ছিল, বৃক্ষলতা ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভব করে তাদের প্রতি যত্নবান ছিল এবং যারা পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করত।-সম্ভবত, সেই প্রয়োজনেই গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে তাদের মধ্যে নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছিল।

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছ থেকে আর্যরা পোড়া ইটের সাহায্যে গৃহনির্মাণপদ্ধতি শিখে নিয়েছিলেন। অথর্ববেদে গৃহনির্মাণের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে আর্যদের আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে যে অর্থনৈতিক চিত্র এখানে পরিস্ফুট, তা থেকে বোঝা যায় যে, নিতান্ত প্রাথমিক স্তরে থাকলেও বিত্তবান শ্রেণীর দ্বারা নির্বিত্তের শ্রমশক্তির শোষণ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে; ফলে, প্রাথমিক উৎপাদক আর ধন ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারছে না, এবং তাদের শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করার জন্যে একটি উপস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। অথর্ববেদে ব্যবহৃত ‘বন’ শব্দটির অর্থ বিক্রয়মূল্যের অংশ; এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুনাফা সম্পর্কিত ধারণা ও তার বাস্তব অভিব্যক্তি তখনকার সমাজে পরিচিত ছিল।

পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক সূক্তগুলিতে আমরা পারিবারিক শান্তির জন্যে প্রার্থনা (সাংমনস্য), দাম্পত্য সম্পর্কে এবং মহিলাদের নিজস্ব প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্যে প্রার্থনা (স্ত্রীকর্ম) এবং গর্ভধারণ ও প্রসবসময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাধিগুলির উপশমের জন্যে প্রার্থনা লক্ষ্য করি। গর্ভবতী রমনী ও

নবজাত শিশুর জন্যে তখনকার সমাজের বিবিধ ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল,–দানব ও অপদেবতাদের বিতাড়িত করাই ছিল এগুলির লক্ষ্য। অথর্ববেদের সমকালীন ঋগ্বেদের একটি সুক্তে (১০ : ১৬২) অথর্ববেদের মতই গার্হস্থ্য বিষয় বর্ণিত; সেখানে আসন্নপ্রসবা নারীর নিরাপত্তার জন্যে অপদেবতাদের বিতাড়নের কথা বলা হয়েছে। তখনকার সমাজে যেহেতু জনসংখ্যার বৃদ্ধি অভিপ্রেত ও প্রয়োজনীয় ছিল, তাই বন্ধ্যাত্বকে সমাজ অভিশাপ বলেই জ্ঞান করত। উপযুক্ত মন্ত্র ও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বন্ধ্যাত্বি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে, সমগ্র অথর্ববেদ বৈদিক ধর্মচর্যার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বহু স্ত্রী-আচার মূলত নারীসমাজের দ্বারাই আচরিত ও পরিচালিত হত।

অন্যদিকে বহুপত্নীক স্বামীর অবিভক্ত প্রেম ও মনোযোগ লাভ করার জন্যে প্রার্থনা এবং প্রণয়িনীর প্রেম-অধিকারের জন্যে স্বামী বা প্রণয়ীর প্রার্থনাও চোখে পড়ে। শ্রীকর্ম বিষয়ের সূক্তগুলির মধ্যে রয়েছে স্পষ্টত প্রণয় আকর্ষণের উদ্দেশ্যে জাদুক্রিয়া-ঈপ্সিত প্রণয়ীর চিত্ত জয় করার জন্যে বা শীতলহাদয় প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রেম উদ্রেক করার জন্যে সম্ভবত প্রণয়বর্ধক পানীয়, প্রলেপ ও রক্ষাকবচ ব্যবহার করা হোত। পিতৃগৃহ-নিবাসিনী পরিণতবয়স্কা অনূঢ়া কন্যারও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে কিছু কিছু প্রার্থনা আছে। স্পষ্টতই সেই সময় বিবাহ সকল নারীর পক্ষেই আবশ্যিক বলে সমাজে বিবেচিত হত এবং অনূঢ়া যুবতী সমাজের দৃষ্টিতে কন্টক-স্বরুপ হয়ে উঠত; কুলপা কন্যারূপে তার উপস্থিতি তাই তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকতর সমৃদ্ধি ও সম্পত্তির বৃদ্ধির ফলে সামাজিক ক্ষমতা সম্পূর্ণতই পুরুষের অধিগত হয়ে পড়েছিল; অনূঢ়া নারীর সম্পত্তির অধিকার বিতর্কের বিষয়বস্তু হওয়ার ফলে সেই নারী অনিবার্যভাবেই সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল।

স্ত্রী-আচারগুলিতেও প্রণয়সম্পর্কিত জাদুতে সাধারণত অগ্নি যে আহুত হতেন, সম্ভবত তার কারণ এই যে, আবেগের প্রতীকী প্রকাশ হওয়া ছাড়াও তিনি প্রতিকূল দানবশক্তির বিরুদ্ধেও কার্যকরী ছিলেন।

সমাজ (অথর্ববেদ সংহিতা)

সামাজিক জীবন সম্পর্কিত সূক্তগুলির মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা রয়েছে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :–সমৃদ্ধি, সন্তানের স্বাস্থ্য, গোধন, যথাকলে বৃষ্টি, ভূমির উর্বরতা, পর্যাপ্ত শস্য, সম্পদবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য, গৃহ ও শস্যক্ষেত্রের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নিভয়-জনিত শস্যহানির আশঙ্কা থেকে রক্ষা, সর্পদংশন, আকস্মিক মৃত্যু, শক্রির আক্রমণ ও ধ্বংসপ্রবণ দানবশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়সূচী থেকে স্পষ্টতই কৃষিজীবী সমাজের চিত্রটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যার অভীষ্ট ছিল সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ শষ্যভাণ্ডার। সমস্ত কৃষিজীবী সমাজে আতিথেয়তা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হ'ত অথর্ববেদও এবিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত পোষণ করে। অতিথিসেবা পবিত্র সামাজিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। স্পষ্টতই এই প্রথা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ও উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা আর্যদের বিশ্ববীক্ষারই নিদর্শন। আর্যরা তখনও যথেষ্ট সঞ্চরণশীল ছিলেন বলে স্থায়ী গৃহস্থদের সমৃদ্ধির ওপর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কতকটা নির্ভরশীল ছিলেন। অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানগুলির তালিকা থেকে মনে হয় যে, অপরিচিত গ্রামবাসীদের মধ্যে স্থায়ীভারে বসবাস করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য নবাগত ব্যক্তিকে দেওয়া হ'ত ।

খাদ্য বা অন্নকে উজ্জ্বল ভাষায় প্রশংসা করা হয়েছে; তাই আমরা উষ্ণ, পীতবর্ণ ও পুষ্টিকর অন্নে পূর্ণ থালার বর্ণনা পাই, যা স্বয়ং সূর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, কেননা পরোক্ষভাবে সমস্ত খাদ্যই সূর্য থেকে উৎপন্ন। জীবনীশক্তি, যে রহস্য-গূঢ় সত্ত্বা প্রাণ থেকে প্রাণহীনকে পৃথক করে, অন্ন থেকেই তা' উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নববধূর প্রতি যে ধরণের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল, তা থেকে মনে হয় যে সেই সময়ের সমাজ থেকে অথর্ববেদের সমাজ গুণগতভাবে ভিন্ন। প্রতিষ্ঠাপনসূক্ত এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, নারী সেই সমাজে স্বাধীনতা ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। তবে বিধবা-বিবাহের সুস্পষ্ট উল্লেখ। অথর্ববেদে পাওয়া যায় (৫। ১৭। ৮; ৯ | ৫। ২৭); আবার সতীদাহের উল্লেখও এতে আছে (১৮।৩।১,৩)

কৃষিব্যবস্থার বিবিধ দিকসম্পর্কিত সূক্তগুলির প্রয়োগ অথর্ববেদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ঋগ্বেদের অধিকাংশই আর্যদের কৃষিজীবী হয়ে ওঠার পূর্বে রচিত; সেইজন্য গোধন, অন্যান্য পশু ও অশ্বের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বহু সূক্ত নিবেদিত হলেও কৃষিকার্য সম্পর্কিত সূক্ত বিরল। অথর্ববেদে প্রায়ই আমরা অনেক নতুন নামের উদ্ভিদ ও নানা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় সেগুলির ব্যবহার দেখতে পাই। এই পর্যায়ে 'গোধন' 'সম্পদে'র প্রতিশব্দ হয়ে পড়েছে এবং অনেক প্রার্থনায় তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যাধিপ্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের উদ্বেগ প্রতিফলিত। কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় পশুদের প্রতি মনোযোগ খুবই স্বাভাবিক, কেননা অথর্ববেদ মূলত সেই জনগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি কৃষিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর জন্য সাধারণ প্রার্থনা ছাড়াও রক্ষাকবচ, প্রলেপ, মায়াঞ্জনের ব্যবহার, গোদান ও 'মহাব্রীহি' প্রভৃতি সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও মেধার জন্যে প্রার্থনা এবং সেইসঙ্গে গৃহনির্মাণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মঙ্গলবিধানের আকাঙক্ষায় প্রার্থনা বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা,–সামাজিক ও পারিবারিক

জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় বহন করছে। সভা ও সমিতির উল্লেখ থেকে স্বায়ত্তশাসন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। অথর্ববেদের পুরোহিত রাজার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ব'লে এ গ্রন্থে প্রশাসনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ থাকা খুবই স্বাভাবিক। যে যুগে সমগ্র উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক রাজাই প্রতিবেশীর রাজ্য গ্রাস করে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে উৎসুক ছিলেন, সে যুগে অথর্ববেদের পুরোহিতের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই অংশত রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল। শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়াও পুরোহিতকে রাজ্যাভিষেক বা সৈন্যাভিযানের সময়ে সর্বাত্মক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হত। সামাজিক শ্রেণীরূপে ক্ষত্রিয়দের উত্থান ও প্রাধান্য অথর্ববেদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সোমযাগগুলি বিশদ ও দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠার যুগে রাজন্য। শ্রেণীর প্রাধান্যলাভ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, কেননা প্রভূত ব্যয়সাধ্য ও অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘায়ত যজ্ঞানুষ্ঠানের আর্থিক দায়িত্ব বহন করা অন্য কোনো শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্ষত্রিয়দের পৃষ্ঠপোষকরূপে 'ক্ষত্রিভৃৎ অগ্নি' নামে অগ্নির বিশেষরূপ তখনই পরিকল্পিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতসম্প্রদায়ের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম ছিল না। সামাজিক শ্রেণীরূপে ব্রাহ্মণের পবিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ থেকে বোঝা যায় যে, অথর্ববেদের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক সূক্ত অনেক পরবর্তীকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে রচিত, যখন সমাজে শ্রেণীবিন্যাস স্পষ্ট এবং ব্রাহ্মণের অবস্থান সমাজের শীর্ষস্থানে।

০৯. দেবসঙ্ঘ

ঋগ্বেদের দেবতারা যদিও অথর্ববেদেও উপস্থিত রয়েছেন, তথাপি ভাগ, অর্যামা, অংশ, দক্ষ, মার্তণ্ড, অদিতি এবং দৌ-এর মতো যে সমস্ত গৌণ দেবতা। ঋগ্বেদের পর্যায়েই ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন, অথর্ববেদে তারা আরও ছায়াবৃত ও প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃতি। এইসব দেবতারা ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি অথর্ববেদে এসে পৌঁছেছিলেন এবং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ঋগ্বেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে অথর্ববেদের সূক্তগুলির শিরোদেশে যান্ত্রিকভাবে তাদের আরোপ করা হয়েছিল। কেননা মৌলিক অথর্ববেদীয় সুক্তিগুলি স্বভাববৈশিষ্ট্যে ঐন্দ্রজালিক হওয়ার ফলে এগুলি প্রকৃত অর্থে দেবতার প্রভাবের বাইরে অবস্থিত। ঋগ্বেদের তুলনায় অথর্ববেদে অগ্নির অনেক বেশি কার্যকলাপ ও নাম রয়েছে। যেমন :–রক্ষোঘ্ন, সপত্নহ, দস্যুনাশন, পাপমোচন ও শালাগ্নিদৈবতা। ঋগ্বেদের আপ্রীসূক্তেব, মতো অগ্নির আরও বহু ধরনের নাম ও বিশেষণ আমরা পাই। অগ্নির উপর অথর্ববেদে এই যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা ইরাণীয় অগ্নিবাচক 'অথর্' ও অগ্নিচর্যর পুরোহিত অথর্বার অন্তর্লীন সম্পর্কের কথা বিবেচনা করতে পারি। পূর্বেই দেখেছি অথর্ববেদের তিনটি রচয়িতা বংশ–অথর্বা, ভৃগু ও অগ্নির–বুৎপত্তিগতভাবে অগ্নির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত।

অথর্ববেদের বহু সূক্ত যেহেতু ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি ঋণ হিসাবে গৃহীত, তাই এগুলির সঙ্গে সহগামী দেবতারাও অনিবার্যভাবেই এখানে উপস্থিত। ব্রাত্যসূক্তের সঙ্গে আমরা মহাদেবকে (ঈশান বা শিব নামে) পাই, যার শারীরিক বর্ণন র মধ্যে পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিশ্লেষণ নীললোহিতের পূর্বভাস সূচিত হয়েছে। অথর্ববেদের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের মূলধারা ইতোমধ্যেই ইতিহাস, গীতিকা ও বিখ্যাত পুরুষদের সম্পর্কে লোকশ্রুতি দ্বারা সমৃদ্ধ হতে শুরু হয়েছে। বেদ এবং বেদমাতা সম্পর্কিত ধারণা যে অথর্ববেদে দেবতায় পরিণত হয়ে গেছে, তার মধ্যে সম্ভবত সংহিতা সাহিত্য রচনার সমাপ্তি ও পবিত্র লোকোত্তর শাস্ত্ররূপে তাদের স্বীকৃতি পাওয়ার প্রমাণ স্পষ্ট।

অথর্ববেদে রুদ্রদেবের সঙ্গে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত, তা ঋগ্বেদে দেখা যায়নি; তাই, তিনি এখন বাণিজ্য-যাত্রায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং গৃহ, শস্য, ক্ষেত্র ও জলাধার থেকে সর্প, কুকুর, শৃগাল, বাজপাখি, অজগর, মশামাছি ইত্যাদি বিতাড়ন করেন। দেবতাদের পাশাপাশি বিচিত্র ধরনের অর্ধদেবতা, ভূতপ্রেত, সর্প, অপ্সরা ইত্যাদির দেখা পাওয়া যায়। লোকায়াত ধর্মের লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্গত অথর্ববেদ বোদরুপে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে লোকমানসের গহনে নিহিত জনপ্রিয় প্রত্নকথার একটি সমগ্রস্তর যৌথ অবচেতন থেকে উত্থিত হয়ে সচেতন সাহিত্য-রচনায় স্থানলাভ করে। ‘মধুকশা” নামক রহস্য-গূঢ় ধর্মচর্যার সঙ্গে অস্বীদের সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। ভৃগুর সঙ্গে সম্পর্কিত ও অথর্ব-ধারার অন্তর্গত দধ্যঙ্ ঋষি এই গোপন মধুবিদ্যার তত্ব অশ্বীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

দর্শন (অথর্ববেদ সংহিতা)

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর মধ্যে সৃষ্টিতত্বমূলক ও আধ্যাত্মিক সূক্তের উপস্থিতি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নবীনতর অংশে এই ধরনের সূক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃশায়ী পরমাত্মার ধারণা পরবর্তী কালেরই সৃষ্টি; সম্ভবত, ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী বহির্ভুত সেই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই তা অধিগৃহীত, যাদের একাংশ হয়তো একেশ্বরবাদী ছিল এবং এরই পরবর্তী স্তরে বিমূর্তায়নের প্রবণতা থেকে অদ্বৈতবাদ জন্ম নিয়েছিল। ব্রহ্মা বা আত্মা বিষয়ক জ্ঞান বহু সূক্তে আলোচিত হয়েছে। ঋগ্বেদের অন্তর্গত বৃহস্পতি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিরাট ও আত্মার মতো প্রাচীন নামগুলি যেমন এখানে পুনর্বার উপস্থিত হয়েছে, তেমনি বেন, রোহিত ও স্কম্ভের মতো নতুন কিছু

অধ্যাত্মতত্ত্বের ও তদ্বাচক দেবতার নামও দেখা যাচ্ছে, এতে বিমূর্তায়নের বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্রমিক কিছু স্তর প্রতিফলিত। সৃষ্টির অন্তর্গত রহস্য যে অথর্ববেদের বিভিন্ন কবিকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার বহু প্রমাণ আমরা পাই। অন্তিম পর্যায়ের কিছু সূক্তে পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের ব্যাকুলতা ও সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস অভিব্যক্ত হয়েছে। জ্ঞান ও উপলব্ধির জন্যে ব্যাকুল প্রার্থনায় বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের স্বভাববৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত–ঋগ্বেদের সর্বশেষ পর্বে তার শুরু এবং উপনিষদের মধ্যে তার সমাপ্তি।

প্রাচীনতম কাল থেকে বৈদিক আর্যরা 'ব্রহ্মণ্' শব্দে সেই ঐন্দ্রজালিক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাটি বুঝতেন, যা বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত। তারা বিশ্বাস করতেন যে, যথাযথ মন্ত্রের সাহায্যে উপযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে আহূত হয়ে, প্রত্নকথা ও অনুষ্ঠানসমূহে নিহিত ব্রহ্মের সুপ্তশক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই শক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন সৃষ্টিরহস্য ভেদ করার উৎসাহে নিজস্ব পথে ক্রমশ গুরুত্ব অর্জন করল, তখন ব্রহ্মাণ শব্দের অর্থগৌরবও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। অথর্ববেদের পুরোহিতদের যজ্ঞে কোন প্রত্যক্ষ আবশ্যিক ভূমিকা ছিল না ব'লে তারা আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনায় ব্যাপৃত ছিলেন, এবং তাদের 'ব্রহ্মা' বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ বলেই অভিহিত করা হত; অথর্ববেদকেও বলা হ'ল ব্রহ্মা বেদ।

'কালে'-এর উদ্দেশে নিবেদিত দুটি সুপ্রসিদ্ধ সূক্তে মোট পনেরোটি শ্লোক গ্রথিত হয়েছে। কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট, এই দুটি সূক্তে কালের যে আধ্যাত্মিক ভাবমূর্তি পরিস্ফুট হয়েছে, তাতে কাল অদৃশ্য, সৃজনশীল এবং ব্রহ্মাণ্ডধারণকারী চিরন্তন পরমসত্তা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দেবকল্পনাতেও কালের দেবায়ন ঘটেছে। ভারতে কালের দেবায়নের সঙ্গে স্রষ্টারূপী সময়ের প্রতীকায়িত দেবরূপে 'প্রজাপতি'র উত্থান একই সূত্রে গ্রথিত। সভা ও সমিতিকে যজ্ঞের সঙ্গে

নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত করে দেখানো হয়েছে। অথর্ববেদে আরো কিছু অতীন্দ্রিয় ধারণা মাঝেমাঝেই অভিব্যক্তি হয়েছে। যেমন, সৃষ্টিশীল প্রেরণারূপে বিরাট। বাস্তব জগতে বিরাটকে যে দুগ্ধবতী গাভীর সঙ্গে, আধ্যাত্মিক স্তরে যে রহস্যগুঢ় বাক-এর সঙ্গে এবং অতিজাগতিক স্তরে যে রক্ষাকারী শক্তির সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চৌদন আজও তেমনি হঠাৎ অতিজাগতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে অনন্ত যজ্ঞের প্রতিরোপ হয়ে উঠেছে। স্কম্ভের মধ্যেও আমরা বিমূর্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করি; সমগ্র সৃষ্টির উপগঠনরূপে তারই বিভিন্ন অংশ থেকে বিশ্বজগতের উপাদানসমূহ আবির্ভূত। স্কম্ভ ও কাল সম্পর্কিত ধারণা—বর্ষ, ঋতু, মাস, পক্ষ, মহাশূন্য ইত্যাদির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সৃষ্টির আদিকারণ বিষয়ে বিমূর্ত ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটেছে "জৈষ্ঠব্রহ্মের"র উদ্দেশে রচিত একটি সূক্তে।

ব্রহ্মৌন্দন, প্রাণ, ব্রহ্মচর্য ও কিছু কিছু বস্তু ও ধারণা বিমূর্ত ভাব-রূপে বন্দিত হয়েছে। সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা রূপে রোহিতের বন্দনা থেকে মনে হয়। সূর্যদেবই সেখানে বিমূর্তায়িত, আবার অন্য একটি অনুপুঙ্খ থেকে অনুমান করা যায় যে, রোহিত ও অদিতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পার্থিব রাজা ও তার সঙ্গিনী নারীরা গৌরবান্বিত হয়েছেন। একটি দ্ব্যর্থবোধক সূক্ত একই সঙ্গে পুরুষ ও অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি প্রযোজ্য। এইসব অসংখ্য আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ভাববস্তুকে নিছক একই বিমূর্ত ভাবনার বিভিন্ন নামান্তর বলে মনে করা যায় না; তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবগত পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবত, ভিন্ন ভিন্ন ঋষির দ্বারা এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও যুগে এদের উৎপত্তি হয়ে কালক্রমে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মধ্যেও বিশ্বাসের নানা শাখায় এগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

অথর্ববেদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যার যে পৃথক চরিত্র রয়েছে, তার সঙ্গে ঋগ্বেদের শেষতম আধ্যাত্মিক সূক্তের সাযুজ্য লক্ষণীয় : উভয়ের ভাষাই সাংকেতিক, অতীন্দ্রিয় গূঢ়বিদ্যার উপযোগী,–সম্ভবত সমাজের কয়েকটি গোষ্ঠী বিশেষ যত্নের সঙ্গে সেই গোপন রহস্যবিদ্যাকে লোকচক্ষুর আড়ালে সংরক্ষণ করত, উপনিষদে এসে আমরা এ তথ্যের প্রমাণ পাই। প্রত্নকথা ও অনুষ্ঠানপরায়ণ যুগের ফসলরূপে এরা অনিবার্যভাবে অর্ধসাংকেতিক প্রত্নপৌরাণিক ভাষায় বাস্তবতা সম্পর্কিত নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছে। কয়েক শতাব্দী পরে দেবকল্পনা ও অনুষ্ঠানচর্যার সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন যখন প্রায় ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন আমরা যথার্থ বিমূর্ত তাবনার প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি উপনিষদের প্রত্নপৌরাণিক পরিমণ্ডল-বহির্ভূত অধ্যাত্মবাদী চিন্তার মধ্যে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন মূল্যবোধের কাঠামো প্রয়োজনীয় বলে উপস্থাপিত না করছে ততক্ষণ নতুন অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্র আবিষ্কারের প্রয়াস শুরু হবে না এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যা অনিবার্যভাবেই প্রত্নকথা, অনুষ্ঠানচর্যা, ইন্দ্রজাল ও রহস্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রক্ষা করে চলবে।

ধর্মবিশ্বাস

আমরা যখন অথর্ববেদের ধর্মবিশ্বাসের কথা বলি, বৈদিক ও অবৈদিক আর্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য ও আদিম ধর্মমতগুলির লঘু এবং বৃহৎ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক সংমিশ্রণে পরিণতিই আমাদের উদ্দিষ্ট। অথর্ববেদের সূক্তগুলি যজ্ঞানুষ্ঠানের বিভিন্ন আবিচ্ছেদ্য কুশীলব অর্থাৎ পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও রাজন্যদের কেন্দ্র করেই রচিত; এছাড়া, ইন্দ্রজাল ও জাদু

অনুষ্ঠান এবং কল্যাণপ্রসু অনুষ্ঠানে এবং অশুভ অভিচার ক্রিয়াও এ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ ঐতিহ্যে প্রধান দেবতারা মূলত ঋগ্বেদ থেকেই গৃহীত, কখনো কখনো দেবতাসহ কয়েকটি সম্পূর্ণ ঋগ্বেদীয় সূক্তই সামগ্রিকভাবে বা অংশত ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে; কখনো বা সূক্তকে সম্রান্ত করে তোলার প্রয়োজনে ঋগ্বেদীয় দেবতাদের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকলাপ অথর্ববেদে বহুলাংশে পবিবর্তিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, অগ্নির ভূমিকা এখন বহুধাবধিত। এমনকি, কখনো-বা দেবতাদের ভূমিকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে–যেমন অগ্নি বৃক্ষের, মিত্রাবারুণ গুপ্তর, মরুদগণ পর্বতের, সূর্য চক্ষুর, মরুদগণেব পিতা প্রাণিজগতের এবং মৃত্যু জনগণের অধিষ্ঠাতা দেবতা। বিভিন্ন দেবতার মধ্যেও নূতনভাবে সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে; বরুণানী স্বপ্নের জননী, যম তার পিতা এবং তিনি স্বয়ং অরররু নামে পরিচিত। তবে, অন্যান্য সংহিতার তুলনায় অথর্ববেদে উপদেবতাদের প্রাধান্য বেশি : রোহিত, স্কম্ভ ও বাস্তোস্পতিকে দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা যায়। ব্রাত্যসূক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত শিবের বিলম্বে আগত নামগুলি একইভাবে উল্লেখযোগ্য : ভব, শর্ব, ঈশান, নীললোহিত, পশুপতি ও উগ্রদেব।

'ব্রাত্য' শব্দটিও দেবনাম রূপে ব্যবহৃত এবং কালক্রমে নামটি যে বিশ্বদেবের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তার কারণ আর্যদেবসঙেঘ নবাগত দেবতাকে অন্যান্য ঋগ্বেদীয় দেবতার মতো সর্বব্যাপী এক দেবতার সম্মানে ভূষিত করা হত। স্পষ্টতই ব্রাত্য বৃহৎ ঐতিহ্যে ধর্মের বিকল্প শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাত্য সূক্তগুলিতে প্রধান শব্দ হ'ল 'অনুব্যচলন' বা অনুসরণ করেছিল। এই ব্রাত্যকে কী অনুসরণ করে? যজ্ঞধর্মের সঙ্গে নিয়ত সংশ্লিষ্ট অনুপুঙ্খাসমূহ, অর্থাৎ অনুষ্ঠান-পরিচালক পরোহিত, উপকরণসমূহ, দেবতারা, ছন্দসমূহ, এমনকি বিভিন্ন দিক। এই সমস্তই ব্রাত্য, আবার সমস্তই তিনি অতিক্রম করে যান। ব্রাত্য সূক্তগুলির অধিকাংশই যে রহস্যপূর্ণ ব'লে মনে হয়, এর কারণ

এই যে, এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক প্রয়োগবিধি ইতিমধ্যে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। এই সূক্তগুলিতে যে প্রবণতা স্পষ্ট, তা হ'ল, সর্বজনগ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় আনুষ্ঠানিকতা ও দেবকাহিনী নির্মাণের সুব্যক্ত লক্ষ্য। সাধারণভাবে এই প্রবণতাই পরবর্তী কালের সমগ্র বৈদিক ধর্ম ও সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ইন্দ্রজাল বা জাদু

আমরা দেখেছি কীভাবে ইন্দ্রজাল সমগ্র অথর্ববেদ সংহিতার পরিব্যাপ্ত রয়েছে। তবে, এই ইন্দ্রজালের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই; তার বহু লক্ষ্য ও প্রকরণ রয়েছে–যথোপযুক্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসহ অতিলৌকিক শক্তিযুক্ত মন্ত্রপূত শব্দ উচ্চারণের সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই 'জাদু' বা 'ইন্দ্রজালে'র উদ্দেশ্য। পার্থিব সুখই এর লক্ষ্য–কখনো সাধারণ পদ্ধতিতে, কখনো বা সমস্যা ও মহামারীর উপশমের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। ঐন্দ্রজালিক মোহ বিস্তার করে এবং ওষধি-প্রয়োগ ও অপদেবতার সাহায্য নিয়ে ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভের চেষ্টা করা হত। নির্দিষ্ট কিছু জাদুক্রিয়ার সাহায্যে নানা নামে দানব, রাক্ষস, পিশাচ, অপ্সরা ও ভূতপ্রেতকে আহ্বান ও নিয়ন্ত্রণ করা হত। বৃক্ষলতা ও ওষধি থেকে নানা ধরনের ঐন্দ্রজালিক ওষধি ও চিকিৎসার উপযোগী ভেষজ প্রস্তুতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ধরনের ক্রিয়ার আকাঙক্ষা থেকে পরিতৃপ্তিতে কাল্পনিক উত্তরণ লক্ষণীয়, –কৃমিবিনাশক অনুষ্ঠান কিংবা প্রণয়জাদুর ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানগুলির অন্তিম অংশে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যৌন-শক্তিবর্ধক ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান 'বাজীকরণ' নামে পরিচিত; এক্ষেত্রে আহুত দেবতার 'শেপ অর্ক' নামটিতে সূর্যের উর্বরতাশক্তির প্রতি স্পষ্ট

ইঙ্গিত। বেশ কিছু সূক্তে যৌনদক্ষতা ও আবেগনির্ভর মানসিক আদান-প্রদান, হৃদয়-বিনিময়, ক্রোধের উপশম ইত্যাদির ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠাপন, প্রতিসঞ্জানন, সন্মোহন, উচাটন ইত্যাদি নানাবিধ বশীকরণ জাতীয় জাদু অনুষ্ঠানের বহুল-প্রয়োগ লক্ষণীয়। গ্রামীন জাদু-পুরোহিত বা আদিম ইন্দ্রজালের প্রভাব স্বর্গ আরোহনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জাদু-প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নিহিত। আবার সত্যানুত পরীক্ষা-জাতীয় অনুষ্ঠান স্পষ্টতই নৈতিক ও পরমর্থিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল ছিল; প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বজগৎ যেহেতু সর্বতিক্রমী সত্য বা ঋতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্যে পাপকর্মা বা অনৃতকালীকে নিশ্চিতই ইন্দ্রজাল-নিয়ন্ত্রিত অদৃশ্যশক্তি উপযুক্ত শাস্তি দেবে,–এ বিশ্বাস ছিল। শত্রুবিনাশের জন্যে সূক্ত উচ্চারণ করার সময় তদুপযোগী, ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে একটি ভেকের প্রতীকী ব্যবহার করা হত। তেমনি বিষক্রিয়া থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে উইটিবির মাটিকে জাদুক্রিয়ার ব্যবহার করা হ'ত।

ঐন্দ্রজালিক সূক্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হ'ল কৃত্যা ও কৃতাপরিহরণ। যাতু কিংবা রক্ষোবিদ্যা বা অভিচার নামে পরিচিত বিশিষ্ট ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার তিনটি উপবিভাগ রয়েছে : কৃত্যা (মোহবিস্তারী যাদু), বলগ (সাধারণত কলস বা অন্ধকার গুহায় লুক্কায়িত গোপন জাদুক্রিয়া) ও মূল্যকর্ম (বৃক্ষমূল ইত্যাদির সাহায্যে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রজাল)। এই ত্রিবিধ ইন্দ্রজালেই আঙ্গিরার সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের বিপরীত মেরুতে বয়েছে কৃত্যাপরিহরণ, কৃত্যাদূষণ বা প্রত্যাভিচার-এদের মূল উদ্দেশ্য হল কোনো ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া নিবারণ। অভিচারকে যেমন যাতুধান অর্থাৎ পিশাচ, দানব বা দুষ্টু আত্মার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়, প্রত্যাভিচার তেমনই শত্রুপক্ষের জাদুক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তিকে ধবংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। মোহন, বশীকরণ, উচাটন প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি 'কৃত্যা'র অন্তর্গত; 'বলগ'

জাতীয় ক্রিয়া পাতাললোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ধবনের গোপন রহস্যানুষ্ঠান এবং বিশেষত শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত কবার জন্যেই ব্যবহৃত, ‘মূলকর্ম’ লোকরসায়নের উপর নির্ভরশীল, কেননা আপন উদ্দেশ্য পুরণের জন্যে এটি (অন্য দুই প্রকার ইন্দ্রজালের অন্তর্গত) বৃক্ষমূল ও ওষধিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করত।

আঙ্গিক ও ভাষা

অথর্ববেদের ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার থেকে এর তুলনামূলক অর্বাচীনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাচীনতর উদীচ্য বা মধ্যদেশীয় ভাষার ‘অশ্রীর’ বা ‘অশ্লীল” অথর্ববেদে ‘অশ্লীল’ রূপে রয়েছে; এতে মনে হয় যে, আর্যরা ইতোমধ্যে মগধের উপভাষার সংস্পর্শে এসেছে, ‘র’ এর পরিবর্তে ল’-এর প্রয়োগ যার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

পরিমাণগতভাবে অথর্ববেদে সাংকেতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত রচনা অনেক বেশি। সাধারণভাবে সুলভ ধ্রুবপদগুলি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রমে লব্ধ পঙক্তি ও অর্ধপঙক্তিসমূহের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করি। প্রচলিত অর্থে এইগুলি অবশ্য ধ্রুবপদ নয়, কিংবা অসংখ্য পুনরাবৃত্তিকে তাদের স্মৃতিসহায়ক প্রয়োগের দ্বারা ব্যাখ্যাও করা যায় না। বস্তুত, কেবলমাত্র ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্যের সাহায্যেই অন্যান্য সংহিতার তুলনায় অথর্ববেদে এগুলির অধিকতর মাত্রায় ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা চলে। তেমনি একই ব্যাখ্যা ভাষা প্রকরণের যান্ত্রিক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-যেমন আবেগের সাংগীতিক উচ্চাবেচতা অনুযায়ী আরোহী-অবরোহী ক্রমে শব্দবিন্যাস কিংবা তুলনামূলক উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ববাচক শব্দ প্রয়োগ অথবা বিভিন্ন

অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কারের ব্যবহার ইত্যাদি ইন্দ্রজালের উপযুক্ত মোহময় পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

অথর্ববেদের শব্দভাণ্ডারেও যথেষ্ট অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ ছাড়াও বিদেশী প্রভাবের নিদর্শন রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা কিছু শব্দের প্রয়োগে, যেমন তৈমত, উরুগুল ও আলিগি-বিলিগি (এই বিলিগি শব্দের সম্ভাব্য উৎস প্রাচীন আসীরীয় দেবনাম—বিল্‌গি)। নৌবাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সঙ্গে সেসব দেশের যে সম্পর্ক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে স্থাপিত হয়েছিল,—সে সম্পর্কে অন্তত আট শতাব্দীর কিছু বেশি সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অথর্ব বেদ অবশ্য সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদের তুলনায় পরবর্তী সময়স্তরের প্রমাণ বহন করে। রচনাশৈলীতে ঋগ্বেদের তুলনায় একই সঙ্গে প্রাচীনতর ও নবীনতর উপাদান বহন করলেও অথর্ববেদের কিছু কিছু নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ গদ্য নিশ্চিতভাবেই স্বরপ্রবাহ যুক্ত, ফলে পদ্যের নিকটবর্তী। আবার, এ পদের গঠনভঙ্গি প্রচলিত ছন্দোরীতির তুলনায় জটিলতর। অধিকতর জনপ্রিয় ও স্বল্পপরিশীলিত ছন্দপ্রকরণের প্রভাবেই সম্ভবত পদ্যের গড়ন এরকম হয়েছিল। জনপ্রিয় স্মৃতিসহায়ক কাব্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে অনুপ্রাসের প্রয়োগ বারবার ঘটেছে, যেহেতু ঐন্দ্রজালিক প্রতিক্রিয়ার পক্ষে তা কার্যকরী। ঐন্দ্রজালিক সাংকেতিকতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত নানাবিধ বাকপ্রকরণের প্রয়োগ অথর্ববেদে লক্ষণীয়; শ্রোতাদের কাছে স্পষ্টভাবে বিষয়বস্তুকে প্রকাশের পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে এইগুলি ঐন্দ্রজালিক যথার্থ উদ্দেশ্যটিকে গোপনই করেছে। ভাষা। এখানে ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে প্রবেশ করে। রহস্য-গূঢ় প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে, যা শুধুমাত্র গ্রামীণ জাদুপুরোহিত বা শামান এবং প্রকৃতির কল্পিত অধিষ্ঠাতা উপদেবতার নিকটই বোধগম্য বলে মানুষ মনে করত।

অথর্ববেদে এমন কিছু ভাষাগত ও রচনাশৈলীগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, যদিও সামবেদের স্তোত্রসমূহ বা যজুর্বেদের সংক্ষিপ্ত মন্ত্রোচ্চারণ বিধি ভাবগত দিক দিয়ে এর সঙ্গে সাযুজ্য বহন করে। অথর্ববেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হ'ল প্রহেলিকপূর্ণ অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বাক্যাংশ বা শব্দের পুনরাবৃত্তি। এক-চতুর্থাংশ, অর্ধেক বা সম্পূর্ণ পঙক্তি ও স্তবকের পুনরাবৃত্তি চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সংকেতপূর্ণ, স্মৃতি ও ঐন্দ্রজালিকতার সহায়ক। এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যকে পৃথকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক, যাজকতান্ত্রিক ও জাদুপুরোহিতের উপযোগী ব'লে ভাবার কারণ নেই; বস্তু গ্রাহ্য জগতে হস্তক্ষেপ করার উপযোগী অলৌকিক শক্তি উৎপন্ন করার প্রাথমিক প্রয়োজনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথর্ববেদের যে বৈশিষ্ট্য ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও লক্ষ্য করা যায়, তা হ'ল খুব সংক্ষিপ্ত কলেবর সূক্তের উপস্থিতি। অথর্ববেদে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটিমাত্র পঙক্তিতে একটি সূক্ত সম্পূর্ণ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত সূক্তগুলিই পাওয়া যায়; এগুলি সম্ভবত সতর্ক সম্পাদনার চিহ্ন বহন করে। এছাড়া প্রায়ই 'পর্যায়' শ্রেণীর সূক্ত পাওয়া যায়, যেখানে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত মন্ত্রের সাহায্যে একটি দীর্ঘ সূক্ত গ্রথিত—এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়–কেবলমাত্র বিষয়ের দ্বারাই প্রথিত সূক্তটি অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের অঙ্গ-রূপেই মন্ত্রগুলি একটি অভিন্ন সূক্তের অন্তর্গত।

'দর্ভমণি'র প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তে বিদ্বেষসূচক ভাষা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় স্পষ্টতা ও শক্তি অর্জন করেছে; ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাকে এখানে সামগ্রিকভাবে শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ ক'লা হয়েছে; অত্যাচার ও ধ্বংসাসূচক বিবিধ ক্রিয়াপদের ব্যবহারে আবেগের সূক্ষ্ম তারতম্যও স্পষ্ট অভিব্যক্ত; যেমন বিদ্ধ করা, ভেঙে ফেলা, বিমুক্ত করা, চুর্ণ করা, খোঁচা দেওয়া, তীক্ষ্ম অস্ত্র দিয়ে ভেদ করা, ছিদ্র করা, অবরোধ, হত্যা, মন্থন, দগ্ধ, আত্মসাৎ ও ধবংস করা।

ভাষার দিক দিয়ে অথর্ববেদ ঋগ্বেদের তুলনায় অধিকতর পরিশীলিত পর্যায়ের রচনা। পদ্য ও স্বরপ্রবাহ যুক্ত গদ্য অথর্ববেদে যথেচ্ছভাবে মিশ্রিত হয়েছে; সংহিতা সাহিত্যে গদ্য বিলম্বে আবির্ভূত হয়েছিল। চরিত্রগতভাবে এ সংহিতাটির ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। বস্তুত, অথর্ববেদে গদ্য ও পদ্য এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরাপণ করা কঠিন। ছন্দোযুক্ত গদ্য ও নিতান্ত আটপৌরে তাৎপর্যবর্জিত পদ্য যথার্থ সংহিতাশ্রেণীর ছন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশ্রিত হওয়ায় এবং প্রায়ই সংযোজন ও প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের যুগপৎ সন্নিবেশ ঘটায়। এ সংহিতাটির সাহিত্যমূল্য বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে।

কখনো কখনো আমরা সেইসব উপাদানের সংরক্ষণের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করি, যেগুলি রক্ষা না করলে হয়ত জনসাধারণের স্মৃতি থেকে তা' লুপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং, এদের সংরক্ষণ থেকে রচনার অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত না হলেও সংগ্রহের বিলম্বিত প্রয়াস সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। নিশ্চিতভাবে এই প্রক্রিয়ায় ভাষাও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল। শব্দের আঙ্গিকগত রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত কিছুটা শব্দার্থগত পরিবর্তনও ঘটে; আবার, তার মধ্যেই নিহিত থাকে সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনায় পরিবর্তনের প্রবণতা। ঋগ্বেদে যে 'ব্রহ্মণ্' শব্দের তাৎপর্য ছিল ভক্তি, প্রার্থনা, বা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রোচ্চারণ, অথর্ববেদে তার শব্দার্থগত পরিবর্তন ঘটে গেল; সম্ভবত, 'ব্রহ্ম' শ্রেণীর পুরোহিতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে এর অর্থ দাঁড়াল ঐন্দ্রজালিক মোহাবেশ। শুধু তাই নয়, ঋণরূপে গৃহীত ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলির আনুষ্ঠানিক প্রয়োগও নতুন তাৎপর্যবহ, প্রধান শ্রৌতযাগসমূহ পুরাতন প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অথর্ববেদে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হতে থাকল; ফলে, কোনো একসময় এই সূক্তগুলি বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী জাদুমন্ত্রে পর্যবসিত হ'ল।

সূক্তগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও অবনমন ঘটলো। ইন্দ্র ও অগ্নির মত ঋগ্বেদের প্রধান দেবতারা এখন তুচ্ছ বিপদ ও ক্ষুদ্র আশঙ্কা থেকে রক্ষা করার জন্যে আহূত হচ্ছেন। এই সমগ্র প্রক্রিয়া থেকে সম্ভবত দুটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠছেঃ প্রথমত, প্রধান যজ্ঞগুলি কালক্রমে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে; কেননা, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় রাজন্য বা ঐশ্বর্যবান পৃষ্ঠপোষকের পক্ষেই তখন যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেইসঙ্গে সাঙ্কেতিক মন্ত্রগুলিও তখন ক্রমশ গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহে অধিকতর মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অথর্ববেদে প্রতিফলিত লঘু ঐতিহ্যকে স্বীকরণের একটি পদ্ধতি হ'ল আদিম অধিবাসীদের কিছু কিছু ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানকে মূলধারায় যথাযথ শুচিতার সঙ্গে গ্রহণের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করা। বহুযুগ ধরে এ সমস্ত জাদু-প্রক্রিয়ার নিহিত গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ায় রক্ষণশীল সমাজের কাছেও লোক ঐতিহ্যের প্রায়োগিক কুশলতা অনিবার্যভাবেই গৃহীত হয়েছিল। বস্তুত, দুটি ভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে আপস-মীমাংসার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনুঘটক রূপেই অথর্ববেদের এই প্রবণতা সক্রিয় ছিল।

অবশ্য, এ সবই অথর্ববেদের বিলম্বিত স্বীকৃতির কারণগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এই যুগে যাজকতান্ত্রিক সাহিত্যপ্রক্রিয়া রূপে সংহিতা রচনা তার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। অথর্ববেদ সংহিতায় বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্যের কারণরূপে আমরা পুরোহিতদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অবক্ষয়কে নির্দেশ করতে পারি। ঋগ্বেদ (সামবেদ ও যজুর্বেদিও এই ধারারই অন্তর্গত) ও অথর্ববেদ—এই দ্বিবিধ ধারার পুরোহিতসম্প্রদায় প্রচলিত সূক্ত, জাদুমন্ত্র, মোহাবেশ সৃষ্টিকারী শব্দবন্ধ, যুদ্ধগীতি, প্রহেলিকা ইত্যাদি সংকলন ও সংগ্রহ করে এসব রচনাকে সংরক্ষিত করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কেননা, ইতোমধ্যেই কাব্যিক ঐতিহ্য সজীব শক্তিরূপে আপন গুরুত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া কোনো মৌলিক মন্ত্রও যেহেতু আর বহুদিনের মধ্যে রচিত

হয়নি, তাই নিঃশেষ মন্ত্রসংগ্রহ প্রস্তুতির প্রয়াস কেবলমাত্র তখনই সম্ভব বলে বিবেচিত হ'ল।

কাব্যগুণ (অথর্ববেদ সংহিতা)

অথর্ববেদ সংহিতা কাব্যরূপে মূলত ঋগ্বেদীয় কাব্যের সমপর্যায়ভুক্ত হলেও তার কিছু কিছু নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যও রয়েছে। বিষয়বস্তুর মৌলিক প্রকৃতির জন্যেই এই সংহিতা আশু ও বাস্তব-প্রয়োগযুক্ত এবং অধিকতর পার্থিব বিষয়বস্তুগত সাধারণ দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছে। অধিকাংশ রচনাই যেহেতু ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত তাই এদের কাব্যগুণ খুব বেশি নেই। তবে যে সমস্ত সূক্তে বিপদের আশঙ্কা বা ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের আকাঙক্ষা ব্যক্ত হয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও এমন চমৎকার স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায় যা ঋগ্বেদের অল্প কিছু সূক্ত বাদে বেশ দুর্লভ। বিদ্বেষ ও ভীতির আবেগ থেকে বহুক্ষেত্রে শক্তিশালী চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে। ওজস্বিতার জন্যে প্রার্থনা কিংবা রণবাদ্যের প্রতিক্রিয়া বা ক্রুদ্ধ নারীকে শান্ত করার উপায় বা শত্রুর বিনাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব সহজ সরল উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে আবেগজনিত প্রত্যক্ষতার ফলে চমৎকার কাব্যিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রণয়-উদ্বোধিক জাদুক্রিয়ার মধ্যেও অনুরূপ উপমা নির্মাণশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ভীতি ও বিদ্বেষ ছাড়া অন্যান্য আবেগের অভিব্যক্তি থেকেও শক্তিশালী চিত্রকল্পসমন্বিত চিত্তাকর্ষক কাব্যিক মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তবে, কাব্যের এই স্তরে চিত্রকল্পগুলি সাধারণভাবে প্রধান অলঙ্কার অর্থাৎ উপমা, রূপক ও অনুপ্রাস এবং অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে শ্লেষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। করুণ রসাশিত আবেদনের জন্যে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষার বর্ণনা খুবই মর্মস্পশী হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো নিরলঙ্কার সরল প্রার্থনা এবং দরিদ্রের কুটীরের বর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত। ইট-কাঠের সাহায্যে

গৃহনির্মাণের কৌশল আর্যদের অধিগত হওয়ার পর তাদের মনে নিরাপত্তার অতিরিক্ত উপলব্ধি সৃষ্টি হ'ল এবং নবলব্ধ জ্ঞান ও নিশ্চয়তার ফলরূপে জন্ম নিয়েছে অভিনব। সরল কাব্যিক অনুভূতি" তেমনি নববিবাহিত দম্পতীর প্রগাঢ় আবেগের প্রতিফলনেও কাব্যের সৌন্দর্যময় প্রকাশ ঘটেছে।

অন্ত্যেষ্টিবিষয়ক রচনায় বা গর্ভপাত আশঙ্কা থেকে পরিত্রাণের মন্ত্রগুলিতে সাধারণ মানবিক আবেগ-উদ্বেগ, কল্যাণকামনা ইত্যাদি চমৎকার স্পষ্ট ঋজুতায় অভিব্যক্তি। তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিবিড় দর্শনজনিত আনন্দও বিভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্যে নিটোলভাবে প্রকাশিত হয়েছে–এমন কি ঐন্দ্রজালিব বৈশিষ্ট্যযুক্ত সূক্তের মধ্যেও তা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সরল ও সংক্ষিপ্ত পঙক্তিতে সহজ বর্ণনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসঞ্জাত বিস্ময়ের কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। আদিম মানুষের জীবনমুখী চিন্তা ও প্রকৃতিদর্শন জনিত বিস্ময়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা ভূমিসূক্তের মধ্যে লক্ষ্য করি—কাব্যিক প্রকাশের সাবলীল স্পষ্টতা ও শক্তির বিচারে এই বচনাটি যথার্থই অনবদ্য।

অথর্ববেদ যদিও বহু সূক্ষ্মচিন্তা ও অধ্যাত্ম ভাবনামূলক সূক্ত ঋগ্বেদ থেকে আহরণ করেছে, তবুও অথর্ববেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক অতীন্দ্রিয়বাদী ও কাব্যিক দিক দিয়ে হৃদয়গ্রাহী প্রকৃতির শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপাদান এবং উৎস সম্পর্কে চমৎকার সূক্ষ্ম চিন্তা ও উপলব্ধির পরিচয়ও কোনো কোনো রচনায় পাওয়া যায়–ঋজুতা ও প্রত্যক্ষতার গুণে এই সব রচনা কাব্যিক দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। মানুষকে দৈব মহিমায় উন্নীত করার মধ্যে একটি নতুন প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায়; এমন কি মানবদেহকেও বিশেষ মহিমায় মণ্ডিত করা হয়েছে–তাই মানবদেহ সকল দেবতার অধিষ্ঠানভূমি রূপে বর্ণিত। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, দেবতা ও মানুষের সুষম সমন্বয়ে এই বিশ্বজগৎ গড়ে উঠেছে-পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং

জীবনের মর্মগত রহস্য উভয়কেই আবৃত্ত করে। কামনা ও কালের ধারণাকে কেন্দ্র করে অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবনা গড়ে উঠেছে-এই উভয়ই অপেক্ষাকৃত নতুন বিমূর্ত আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং উভয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই পর্যায়েই কামনার সৃজনশীল ভূমিকাকে অতিজাগতিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং শেষপর্যন্ত তা আদিমতম অতৃপ্তিজনিত চাঞ্চল্যে এবং পরমাত্মার সেই মহত্তম একাকিত্বের উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করে— উপনিষদে এই ভাবনাই শেষপর্যন্ত সৃষ্টির মূলাধার স্বরূপ চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অথর্ববেদের পর্যায়ে কামনা যেমন সৃজনশীল শক্তির প্রতিকল্প তেমনি শাশ্বতকাল সম্পর্কিত কিছু কিছু বিমূর্ত ভাবনা যখন বিলম্বে আবির্ভূত হ'ল, ততদিনে তা' সমুন্নত মহিমাযুক্ত ভাবনায় পরিণতি লাভ করেছে। কাল সম্পর্কিত ভাবনা যখন এভাবে জনচিত্ত অধিকার করেছে, ততদিনে কৃষি ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা হয়ে গেছে, কেননা ঋতুচক্র ও শস্যসমূহের আবর্তন লক্ষ্য করেই কাল সম্পর্কে বিমূর্ত ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। পশুচারী সমাজের পক্ষে তা তখনও একটি অস্পষ্ট ধারণা, যেহেতু তাদের পালিত পশুসমূহ সম্পূর্ণ বৎসর জুড়েই বংশবৃদ্ধি করে; ফলত, কাল সম্পর্কিত ভাবগত রূপটি আকস্মিক, অপ্রাসঙ্গিক ও নিস্প্রয়োজন। কেবলমাত্র যখন ভরণপোষণের জন্যে সময়মত বার্ষিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হ'ল এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে শস্য উৎপন্ন হ'ল তখনই মানুষ ঋতুচক্রের যথার্থ আবর্তন সম্পর্কে নিবিড়ভাবে আগ্রহী হয়ে উদ্বিগ্নভাবে ফসলের প্রতীক্ষা করতে শিখল। সেইসঙ্গে মানুষ কালের সম্পূর্ণ অনিবার্যতা ও অমোঘতা সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠল। সম্পূর্ণত মানুষের আয়ত্তের বহির্ভূত, অথচ অদৃশ্যভাবে মানবিক নিয়তি নিয়ন্ত্রণকারী বিমূর্ত ধারণারূপে কাল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলব্ধি দেখা দেওয়ার পরই চরম বিমূর্ত ধারণারূপে বিশ্বজগৎ-স্রষ্টা কালের একটি সমগ্র ভাবায়তন মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সুতরাং অথর্ববেদের কালসূক্ত কাল সম্পর্কে মানুষের অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিকাশই সুচিত করছে।

ঐন্দ্রজালিক কাব্যরূপে এবং জীবন সম্পর্কে মূলত আদিম ও রহস্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ রূপে অথর্ববেদ বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে শত্রুতাপূর্ণ ও জীবন সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে বিদ্বেষপ্রবণ যে ভাবনার অভিব্যক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে–সেই অথর্ববেদেই আবার পাই সর্বব্যাপী অপ্রাপণীয় অথচ নিত্য কল্যাণের ও সার্বভৌম আকাঙক্ষার মহত্তম উচ্চারণ : 'ইহলোক যা কিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন অর্থাৎ হিংস্রতাপূর্ণ, ইহলোকে যা কিছু নিষ্ঠুর, যা কিছু অশুভ–সে সমস্তই শান্ত হোক, কল্যাণে পরিণত হোক, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে শান্তিময় হয়ে উঠুক।' বস্তুত প্রাগবৈজ্ঞানিক যুগে বৈরী প্রকৃতির সম্মুখীন মানুষের অসহায়তার এই হ'ল অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি–যে মানুষ চতুষ্পার্শ্বের অন্ধকার ও অমঙ্গলপ্রদ শক্তির ক্রোধ শান্ত করার জন্যে তীব্র আকাঙ্খা ব্যক্ত করে এবং একই সঙ্গে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে তার শাশ্বত বাসনাকেও প্রকাশ করে।